Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিকির

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাহিনা পারভীন

রোলঃ 216021552

২৭ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিকির

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাহিনা পারভীন

রোলঃ 216021552

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "জিকির" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাহিনা পারভীন, আইডিঃ 216021552 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " জিকির " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৭ মে, ২০২৪ ইং

সাহিনা পারভীন

আইডিঃ 216021552

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকাঃ

আল্লাহ তাআলার পবিত্র নামের মধ্যে যে বরকত, লজ্জত, স্বাদ,আনন্দ ও শান্তি রহিয়াছে, তাহা এমন কোন ব্যক্তির নিকট অস্পষ্ট নহে, যে কিছুদিন এই পাক নামের জিকির করিয়াছে এবং দীর্ঘ সময় উহাতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। এই পবিত্র নাম অন্তরের সুখ ও শান্তির কারণ। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেন -

-الا بذكر الله تطمءنالقلوب

অর্থঃ তোমরা ভালোভাবে বুঝিয়া লও, আল্লাহ তায়ালার জিকির(এর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য আছে যে, ইহার) দ্বারা অন্তর শান্তি লাভ করে।(সূরা রা'দ, আয়াতঃ ২৮)

বর্তমান দুনিয়াতে পেরেশানির ব্যাপক হইয়া গিয়েছে সর্বত্র অশান্তি বিরাজ করিতেছে।জিকিরকে পেরেশান লোকেরা যেন নিজেদের চিকিৎসা ও ঔষধ জানিয়া লইতে পারে এবং সৌভাগ্যবান লোকেরা যেন আল্লাহর জিকিরের মহত্ত্ব জানিয়া লাভবান হইতে পারে।

আল্লাহ তাআলার পবিত্র নামের জিকির সম্বন্ধে যে কোন আয়াত বা হাদিসেও যদি নাও আসিত তবুও সেই প্রকৃত দাতার জিকির এমন এই যে বান্দার জন্য একমুহূর্ত তাহা গাফেল হওয়া উচিত নয়। কেননা ওই পবিত্র সত্তার দান ও অনুগ্রহ প্রতিমুহূর্তে বান্দার উপর এত অধিক পরিমাণে বর্ষিত হইতেছে যেনা উহার কোন শেষ আছে না কোন তুলনা হইতে পারে। এইরূপ মহান দাতাকে স্মরণ করা তাহার জিকির করা তাহার শোকর ও অনুগ্রহ স্বীকার করা একটি স্বভাবজাত বস্তু। কবি বলেন- "আল্লাহ তাআলা লাখো দয়া ও এহসান আমার উপর প্রতিমুহূর্তে বরসিত হইতেছে তাহার জন্য আমার জান কুরবান"।

জিকিরের অর্থঃ

জিকির বা যিকর অর্থ হল স্মরণ করা বা উল্লেখ করা। এটি হলো ইসলাম ধর্মের প্রার্থনার মাধ্যম যাতে আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য বিশেষ কিছু শব্দ বা বাক্যাংশ বারবার উচ্চারণ করা হয়। জিকিরের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা আল্লাহকে স্মরণ করে থাকে।

জিকির শব্দটি আরবী ভাষার “ ذِكْر ” (যিকরুন) থেকে এসেছে। যার অর্থ আল্লার নাম স্মরণ করা। জিকির ইসলাম ধর্মের একটি পবিত্র কাজ হিসেবে গন্য করা হয়। একাকী বা সমষ্টিগতভাবে যিকির করা যেতে পারে। এটি পুতির তৈরি মালা (মিসবাহা, " مِسْبَحَة ") বা হাতের আঙুলের সাহায্যে গণনা করা হয়। যে ব্যক্তি যিকির পাঠ করেন তাকে জাকির (ذَاكِر) বলা হয়, আক্ষরিক অর্থে "যে স্মরণ করে"।

যিকিরের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর নাম ও হাদিস-কুরআন থেকে নেওয়া দুআ। জিকির সম্পর্কিত অনেক হাদিস রয়েছে এবং ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় বই পবিত্র কুরআনে এই বিষয়ে বর্ণনা দেয়া আছে। একটি হাদিস থেকে জানা গিয়েছে জবানে হালকা (বলতে সহজ) কিন্তু মিজানের পাল্লায় ভারি হয়। "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহীল আযিম।" এছাড়া আরো কিছু জিকির রয়েছে সুবাহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু।

আল-কোরআনে জিকির প্রসঙ্গঃ

(আল্লাহর দিকে অভিমুখী হেদায়েতপ্রাপ্ত লোক তারাই) যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়। জেনে রেখো, আল্লাহর স্মরণেই শুধু চিত্ত প্রশান্ত হয়। [সুরা : রাদ, আয়াত : ২৮ (দ্বিতীয় পর্ব)]

তাফসির : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহর জিকির ও স্মরণে অন্তর প্রশান্ত হয়। পবিত্র কোরআনে জিকির শব্দটি বহু জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু বেশির ভাগ স্থানে পৃথক পৃথক অর্থে এ শব্দের ব্যবহার হয়েছে। আল-কোরআনে জিকির শব্দ সর্বমোট ২৬৮ বার এসেছে। ১৫৪ বার এসেছে ক্রিয়া (ফেয়েল) হিসেবে আর ১১4 বার এসেছে বিশেষ্য (ইসম) হিসেবে। (সূত্র : ইসলাম ওয়েব, 'লফযুজ জিকরি ফিল কোরআন')

বিভিন্ন অর্থে জিকির শব্দের ব্যবহার

জিকির শব্দের প্রথম ও প্রধান অর্থ হলো মৌখিকভাবে আল্লাহর স্মরণ বা জিহ্বার জিকির।

যেমন—আল্লাহ বলেন, 'যখন তোমরা নামাজ সমাপ্ত করবে তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহর জিকির (তাসবিহ-তাহলিল) পাঠ করবে।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ১০৩)। অন্য আয়াতে এসেছে, 'হে ঈমানদাররা, তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।' (সুরা : আহজাব, আয়াত : ৪১)

জিকির শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হলো, উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ।

আল্লাহ বলেন, 'তুমি উপদেশ দিতে থাকো। কেননা জিকরা বা উপদেশ ঈমানদারদের উপকারে আসে।' (সুরা : জারিয়াত : আয়াত : ৫৫)

জিকির শব্দের তৃতীয় অর্থ হলো স্মরণ করা। পবিত্র কোরআনে এসেছে : 'তারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা নিজেদের ওপর অবিচার করলে আল্লাহর জিকির করে (আল্লাহকে স্মরণ করে) এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া কে পাপ ক্ষমা করবে?' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৫)

জিকির শব্দের চতুর্থ অর্থ আনুগত্য।

আল্লাহ বলেন, ''তোমরা আমার জিকির (আনুগত্য প্রদর্শন) করো, আমিও তোমাদের 'জিকির' (প্রতিদান দান) করব।''

জিকির শব্দের পঞ্চম অর্থ কোরআন। মহান আল্লাহ বলেন, ‘এটা বরকতময় জিকির (কোরআন)। আমি তা অবতীর্ণ করেছি। তবু কি তোমরা তা অস্বীকার করবে?’ (সুরা : আম্বিয়া, আয়াত : ৫০)

জিকিরের ষষ্ঠ অর্থ মর্যাদা ও গৌরব। আল্লাহ বলেন, ‘কোরআন তো তোমার ও তোমার জাতির জন্য জিকির বা সম্মানের বস্তু।’ (সুরা : জুখরুফ, আয়াত : ৪৪)

জিকির শব্দের সপ্তম অর্থ খবর ও সংবাদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ‘তারা তোমার কাছে জুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, আমি তোমাদের কাছে তার জিকির (খবর বর্ণনা) করব।’ (সুরা : কাহ্ফ, আয়াত : ৮৩)

জিকির শব্দের অষ্টম অর্থ শরিয়ত। পবিত্র কোরআনে এসেছে, ‘যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের জিকির (শরিয়ত) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তাকে দুঃসহ আজাবে প্রবেশ করাবেন।’ (সুরা : জিন, আয়াত : ১৭)

জিকির শব্দের নবম অর্থ লাওহে মাহফুজ (সংরক্ষিত ফলক)। আল্লাহ বলেন, ‘আমি জিকির বা লাওহে মাহফুজের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন (অথবা নেককার) বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে।’ (সুরা : আম্বিয়া, আয়াত : ১০৫)

জিকির শব্দের দশম অর্থ নামাজ। হজরত দাউদ (আ.)-এর ঘটনা প্রসঙ্গে কোরআনে এসেছে, ‘সে বলল, আমি তো আমার প্রতিপালকের জিকির (নামাজ) থেকে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্যপ্রীতিতে মগ্ন হয়ে গেছি। এদিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে।’ (সুরা : আয়াত-৩২)

“অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ।” (সূরা আনকাবূত ৪৫ আয়াত)

আল্লাহ তা’আলা বলেছেন,

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة:١٥٢]

“তোমরা আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব।” (সূরা বাকারা ১৫২ আয়াত)

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾]الاعراف :٢٠٥[

“তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশঙ্কচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ কর এবং তুমি উদাসীনদের দলভুক্ত হয়ো না।” (সূরা আ’রাফ ২০৫ আয়াত)

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾]الجمعة :١٠[

“আল্লাহকে অধিক-রূপে স্মরণ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হও।” (সূরা জুমআ ১০ আয়াত)

তিনি আরও বলেছেন,

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ إِلَى قَوْله تَعَالَى :﴿وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الاحزاب :٣٥]

“নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) নারী, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী (সংযমী) পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী (সংযমী) নারী, আল্লাহকে অধিক

স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী---এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহা প্রতিদান রেখেছেন।” (সূরা আহযাব ৩৫ আয়াত)

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ٤١ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ٤٢ ﴾]الاحزاب﴿ ٤١، ٤٢]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।” (সূরা আহযাব ৪১-৪২ আয়াত)
এ মর্মে আরও অনেক বিদিত আয়াত আছে।

জিকির প্রসঙ্গে হাদিসঃ

জিকির সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে এত বেশি আয়াত রহিয়াছে, সেখানে হাদিসের তো কথাই নাই। এমন কোন হাদিসের কিতাব নাই যাহা জিকিরের আলোচনা থেকে খালি।জিকির সম্পর্কে হাদিস একত্র করা বড়ই কষ্ট সাধ্য ব্যাপার।সাধারণত জিকির বলতে নামাজ, রোজা, হজ্ব যাকাত ও যাবতীয় ইবাদাতকে বোঝায়। তাই আলাদাভাবে জিকির বলতে আমরা মৌখিক জিকিরকে বুঝাই এজন্যই যে, পবিত্র কুরআনে তেলাওয়াত বিষয়ে আলাদা আয়াত আছে, নামাজ বিষয়ে আলাদা আয়াত আছে, ধৈর্য বিষয়ে আলাদা আয়াত আছে, তাসবি -তাহলীল বিষয়ে আলাদা আয়াত আছে, জিহাদ বিষয়ে আলাদা আয়াত আছে ইত্যাদি।
তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিকির বলত সদাসর্বদা মৌখিক জিকিরকে বোঝানে হয়। এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদিস পেশ করা হলো-

(১) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হাদীসে কুদসীতে) এরশাদ ফরমাইছেন, আল্লাহ তাআলা ফরমাইতেছেন, "আমি বান্দার সহিত ঐরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি যেইরুপ সে আমার সহিত ধারণা রাখে, সে যখন আমাকে স্মরণ করে, আমি তাহার

সঙ্গে থাকি, সে যদি আমাকে অন্তরে স্মরণ করে, আমিও তাকে অন্তরে স্মরণ করি, সে যদি কোন মজলিসে আমার জিকির করে, তবে আমি ওই মজলিস হইতে উত্তম অর্থাৎ (নিষ্পাপ ফেরেশতাদের মজলিসে) তাহার আলোচনা করি, আর বান্দা যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তবে আমি তাহার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, সে যদি এক হাত অগ্রসার হয়, আমি তাহার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই, সে যদি আমার দিকে হাঁটিয়া আসিতে থাকে, আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া যাই। (তারগীব, দুররে মানসূর, মিশকাত, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)।

(২) এক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরজ করিলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! শরীয়াতের হুকুম আহকাম তো অনেক রহিয়াছে সেই গুলির মধ্য হইতে আমাকে এমন একটি বিষয় বলিয়া দিন যাহার উপর আমি সব সময় আমল করিতে পারি এবং উহাতে মুশকুল থাকিতে পারি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এরশাদ ফরমাইছেন, আল্লাহর জিকির দ্বারা তুমি তোমার জিব্বাকে সর্বদা ভিজাইয়া রাখো। -(দুররে মানসূর,তিরমিজি, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকিম)

(৩) একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি জিনিস বলিয়া দিব না? যা সমস্ত আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তোমাদের পরওয়ারদিগারের নিকট সবচাইতে পবিত্র, তোমাদের মর্তবাকে অনেক বেশি বুলন্দকারী,আল্লাহর রাস্তায় সোনা রুপা খরচ করা হইতেও বেশি দামি এবং জিহাদের ময়দানে তোমরা দুশমনকে কতল করো আর দুশমন তোমাদেরকে কতল করে ইহা হইতেও বেশি উত্তম, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরজ করিলেন, অবশ্যই বলিয়া দিন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, উহা হইল 'আল্লাহর জিকির'। আল্লাহর জিকির দ্বারা তরতাজা রাখা।(দুররে মানসূর,তিরমিজি,ইবনে মাজাহ, হাকিম)

উক্ত হাদিসের যে জিকিরের কথা বলা হইয়াছে উহা দ্বারা 'জিকিরে ক্কলবি' অর্থাৎ দিলের জিকির উদ্দেশ্য, জবানের জিকির উদ্দেশ্য নয়। আর দিলের জিকির ওই জিকির কে বলা হয় যাহা দৃবারা দিল সব সময়ের জন্য আল্লাহর সহিত জুড়িয়া যায়। আর নিঃসন্দেহে এই অবস্থাটি সমস্ত ইবাদত হইতে উত্তম। যখন কাহারোও ইয়া হাসিল

হয়, তখন তাহার কোন এবাদত ছুটিতে পারেনা।(নামাজ,রোজা, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ)কেননা শরীরের বাহির ও ভেতরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিলের অনুগত দিল যে জিনিসের সহিত জুড়িয়ে যায় সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও উহার সহিত জুড়িয়া যায়। আল্লাহর আশেকগণের অবস্থা কাহারো অজানা নহে। আরো অনেক হাদিসে 'জিকির' সর্বোত্তম আমল বলিয়া বর্ণিত হয়েছে। হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে জিজ্ঞাসা করা হইল, সর্বশ্রেষ্ঠ আমল কোনটি তিনি বললেন, তুমি কি কোরআন শরীফ পড় নাই? কুরআন পাকে আছে, আল্লাহর জিকির হইতে শ্রেষ্ঠ কোন জিনিস নাই। কোরআন পাকে আছে, ولذكر الله اكبر, অর্থাৎ, আল্লাহর জিকির হইতে শ্রেষ্ঠ কোন জিনিস নাই। সালমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যে আয়াতের কথা বলিয়াছেন উহা ২১ তম পারার প্রথম আয়াত। 'মাজালিসুল আবরার' কিতাবের লেখক বলেন, এই হাদীসে আল্লাহর জিকিরকে দান-খয়রাত, জিহাদ অন্যান্য এবাদত হইতে এজন্যই উত্তম বলা হইয়াছে যে, আসল মাকসুদ হইল আল্লাহর 'জিকির' অন্যান্য সমস্ত ইবাদত বন্দেগী হইল এই মূল মাকসুদকে হাসিল করার উসিলা ও মাধ্যম। যদিও তা ফরজ করা হয়েছে। জিকিরও দুই প্রকার 'জবানি জিকির' ও 'ক্বলবি জিকির'। জবানি জিকির হইতে ক্বলবি জিকির উত্তম। আর উহা হইল 'মুরাকাবা ও চিন্তা' আর এই হাদীসেও ইহা উদ্দেশ্য যাহাতে বলা হইয়াছে, 'এক মুহূর্ত ফিকির করা ৭০ বছরের ইবাদাত করা হইতে উত্তম'। 'মুসনাদে আহমদ' কিতাবে আছে। মোটকথা এই সমস্ত আলোচনায় বুঝা গেল, দান খয়রাত জিহাদ ইত্যাদি সাময়িক।সময়ের প্রয়োজনে এগুলো ফরজ ও অবশ্য পালনীয় এবং সময়ের প্রয়োজনে এগুলোর ফজিলত অনেক বেশি কিন্তু 'জিকির' হলো সর্বদা সব সময় যার ফজিলত বহন করে, সব সময় আল্লার সাথে সম্পর্কের রাস্তা তৈরি করা।কিন্তু যখন কাফেরদের উপদ্রব বাড়িয়া যায়,তখন জেহাদের আমল ঐ সমস্ত সব আমল হইতে উত্তম হইয়া যায়।

(৪) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইছেন,-" যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করে আর যে ব্যক্তি করে না এই দুজনের উদাহরণ হইল, 'জীবিত' ও 'মৃতের' মত। যে জিকির করে সে জীবিত আর যে জিকির করে না সে মৃত।(মিশকাত, বুখারী, মুসলিম)

এখানে জিন্দা বলিয়া চিরস্থায়ী জীবনকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, যাহারা এখলাসের সহিত বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করে তাহারা কখনো মরে না বরং তাহারা এই দুনিয়া হইতে বিদায় হওয়ার পরও জীবিতই থাকে। যেমন শহীদগণের ব্যাপারে কুরআন পাকে বলা হইয়াছে, بل احياء عند ربهم অর্থাৎ 'তাহারা নিজেদের প্রভুর নিকট জীবিত'। -(সূরা আলে ইমরান)। অনুরূপ, জিকির কারীদের জন্যও মৃত্যুর পর এক প্রকার বিশেষ জীবন রহিয়াছে।

কারণ, জিকিরকারীরা সিদ্দিক পর্যায়ে চলে যায়।আর পবিত্র কোরআনে তিন শ্রেণির মানুষকে মৃত্যুর পরেও জীবিত বলা হয়েছে সূরা নিসার মধ্যে। নবীগন,শহীদগন ও সিদ্দিকগন। তাই আমরা হাদিস কোরআনের ব্যাখ্যা শুধু নিজেদের সুবিধার্থে নিজেদের দিকে না টানিয়া মহান আল্লাহ যেভাবে চেয়েছেন সেইভাবেই গ্রহণ করা।এগুলোর মধ্যে মুসলিম উম্মহর কল্যান নিহিত।

(৫) হযরত আবু হুরাইরা ও হযরত আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দুইজনেই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, "যে জামাত আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকে আল্লাহর রহমত তাহাদিককে ঢাকিয়া লয়, তাহাদের উপর সাকিনা নাযিল হয়, আর আল্লাহ তায়ালা নিজ মজলিসে (গর্ব করিয়া) তাহাদের আলোচনা করেন। -(দূররে মানসূর, মিশকাত,মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

(৫) সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন,-" কিয়ামতের দিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে যে, বুদ্ধিমান লোকেরা কোথায়? মানুষ জিজ্ঞাসা করিবে, বুদ্ধিমান লোক কাহারা? উত্তরে বলা হইবে যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও সায়িত অবস্থায় অর্থাৎ (সর্বাবস্থায়) আল্লাহ জিকির করিতো, আর আসমান জমিনের সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে চিন্তা ফিকির করিতো, আর বলিতো, হায় আল্লাহ! আপনি এই সবকিছুকে অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই, আমরা আপনার তাসবিহ পাঠ করি, আপনি আমাদেরকে জাহান্নাম হইতে বাঁচাইয়া দিন অতঃপর এই সমস্ত লোকের জন্য একটি ঝাণ্ডা তৈয়ার করা হইবে, তাহারা সেই ঝান্ডার পিছনে চলিবে তারপর আল্লাহ তায়ালা বলিবেন যাও, তোমরা চিরকালের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করো। (দূররে মানসুর)

সর্বপরি আমরা হাদিস দ্বারা অনুধাবন করতে পারি যে, প্রতিটি মানুষের জন্য জিকিরের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। অন্য কোন ইবাদতের মহাত্ম্য দেখিয়ে মৌখিক ও ক্বলবানি জিকিরকে খাট করার কোন উপায় নায়। এটা একজন মানুষকে ভিতর থেকে পরিশুদ্ধ করে সমস্ত ফরজ আমলকে পরিপূর্ণতায় এনে দেয়।

অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতঃ

ইবাদাত সমূহের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত হলো জিকির। অতএব প্রথমে আমরা জানব আল্লাহতালা জিকির সম্পর্কে কি বলেছেন। তার ফজিলত কি। তাই কুরআন মাজিদের আয়াত পেশ করা গেল, ফাজকুরুনি আজকুরকুম।অর্থাৎ, -" তোমরা আমাকে স্মরন কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব"।সাবেত বানানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমার আল্লাহ কখন আমাকে স্মরণ করেন আমি জানি।
লোকেরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি তা কিভাবে জানেন? তিনি বললেন আমি যখন তাকে স্মরণ করি তখনই তিনি আমাকে স্মরণ করেন।

দুনিয়াতে কষ্ট ভোগ করা যতনা সহ্য করা আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের কারণ হয়। দুনিয়াতে দ্বীনের কাজে যতই কষ্ট সহ্য করিবে ততই উচ্চ মর্যাদা সমূহের হকদার হইবে। কিন্তু আল্লাহ পাকের মোবারক জিকিরের বরকত এই যে, আরামের সহিত নরম বিছানায় বসিয়াও যদি কেউ জিকির করে তবুও আখেরাতের এই জিকির তাহার মর্যাদা কারণ হয়।
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি তোমরা সব সময় জিকিরের মধ্যে মশগুল থাকো তবে ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানার উপর ও পথের মধ্যে তোমাদের সহিত মেছাফাহা করিতে শুরু করিবে।

সদাসর্বদা জিকির করার জন্য হুযুর পাক (সাঃ) এর তাগিদঃ

এক হাদিসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হয়েছে, মোফাররিদ লোকেরা অনেক বেশি আগে বাড়িয়া গিয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরজ করিলেন,মুফাররিদ লোক কাহারা? হুযুর সাঃ এরশাদ ফরমাইলেন, যাহারাপাগলপারার ন্যায় আল্লাহর জিকিরে মশগুল হয়। এই হাদিসের কারণে সূফিগন লিখিয়াছেন, বাদশাহ ও আমিরগণকে আল্লাহর জিকির হইতে বিরত রাখা উচিত নয়।কেননা, তাহারা উহার কারনে উচ্চ মর্যাদা লাভ করিতে পারে।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন,তুমি তোমার সুখের সময়গুলোতে আল্লাহ তাআলার জিকির করো, তোমার দুঃখের সময় গুলিতে কাজে আসিবে।হযরত সালমান ফারসি (রাঃ) বলেন, বান্দা যখন তাহার সুখ, আনন্দ ও প্রাচুর্যের সময় আল্লাহ তায়ালার জিকির করে অতপর সে কোন কষ্ট ও মুসিবতে পড়ে, তখন ফেরেতারা বলেন- ইহা কোন দুর্বল বান্দার পরিচিতি আওয়াজ। অতঃপর আল্লাহর দরবারে তার জন্য সুপারিশ করে।আর যে ব্যক্তি সুখের সময় আল্লাহর জিকির করে না, অতপর কোন কষ্ট ও মুসিবতে পড়িয়া আল্লাহকে স্মরণ করেতখন ফেরেস্তারা বলে, ইহা কেমন অপরিচিত আওয়াজ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন- জান্নাতের আটটি দরজা আছে একটি দরজা শুধু জিকির কারীদের জন্য রহিয়াছে।এক হাদিসে আছে,যে ব্যাক্তি বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করেসে মুনাফেকি হইতে মুক্ত। আরেক হাদিসে আছে আল্লাহ তায়ালা তাকে মোহাব্বত করেন।

জিকিরকারীর অন্তর সদাসর্বদা জিন্দা থাকেঃ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এক সফর হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন।এক জায়গায় পৌছাইয়া তিনি বলিলেন,অগ্রগামী লোকেরা কোথায়? সাহাবায়ে কেরাম করিলেন, কতিপায় দ্রুতগামী লোক আগে চলিয়া গিয়াছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিও সাল্লাম ফরমাইলেন,ঐ সমস্ত অগ্রগামী লোকেরা কোথায়? যাহারা আল্লাহর জিকিরে পাগলপারা

হইয়া মশগুল থাকে। যে ব্যক্তি ইহা চাই যে জান্নাতে তৃপ্তি লাভ করিবে সে যেন বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করে।

বুখারী,মুসলিম ও মিশকাত শরীফে এসেছে -
হুযুর পাক সাঃ এরশাদ ফরমাইলেন, "যে ব্যক্তি জিকির করে আর যে ব্যক্তি করে না এই দুইজনের উদাহরণ হইল জীবিত ও মৃতের মত যে জিকির করে সে জীবিত আর যে জিকির করে না সে মৃত। "

জীবন সকলের নিকট প্রিয় এবং মৃত্যুকে প্রত্যেকের ভয় করে। হুজুর সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করে না সে জীবিত হইয়াও মৃত সমতুল্য। তাহার জীবন বেকার। আমার হায়াতকে জীবনেই বলা চলে না প্রকৃত জীবন তো তাহার, বন্ধুর সহিত যাহার মিলন লাভ হইয়াছে।

কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, উক্ত হাদিসে দিলের অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করে তাহার দিল জিন্দা, আর যে ব্যক্তি জিকির করে না তাহার দিল মরিয়া যাই । কোন কোন আলেম আরো বলিয়াছেন উদাহরণটি উপকার ও ক্ষতির দিক বুঝানোর জন্য দেওয়া হইয়াছে।

তাই আল্লাহর জিকির কারীকে যে কষ্ট দেয় সে যেন জিন্দা ব্যক্তিকে কষ্ট দিল। কাজেই ইহার প্রতিশোধ নেওয়া হইবে এবং ইহার পরিণতি তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। আর যে ব্যক্তি জিকির করে না তাহাকে কষ্ট দেওয়ার অর্থ হইল মুর্দাকে কষ্ট দেওয়া। আর মুর্দা ব্যক্তি কোন প্রতিশোধ নিতে পারেনা।

সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন, এখানে জিন্দা বলিয়া চিরস্থায়ী জীবনকে বুঝানো হইয়াছে। কেননা যাহারা এখলাসের সহিত বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করে, তাহারা কখনোও মরে না বরং তাহারা এই দুনিয়া হইতে বিদায় হওয়ার পরও জীবিতই থাকে যেমন শহীদ গণের ব্যাপারে কুরআন পাকে বলা হইয়াছে, بل احياء عند ربهم অর্থাৎ, "তাহারা নিজেদের প্রভুর নিকট জীবিত।" অনুরূপ জিকির কারীদের জন্যও মৃত্যুর পর একপ্রকার বিশেষ জীবন রহিআছে। (সূরা আল ইমরান-১৬৯)

এক হাদীসে এসেছে, আল্লাহ তাআলার উত্তম বান্দা তাহারা যাহারা আল্লাহর জিকিরের জন্য চন্দ্র, সূর্য, তারা ও ছায়ার প্রতি লক্ষ্য রাখে অর্থাৎ সঠিক সময়ের নির্ণয়ের ব্যাপারে বিশেষ এহতেমাম করে বর্তমান যুগে ঘড়ি ঘণ্টার অধিক প্রচলন যদিও ইহার প্রয়োজন মিটাইয়া দিয়েছে তবুও এই বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান থাকা ভালো যাহাতে কখনো ঘড়ি নষ্ট হয়ে গেলেও সময় নষ্ট না হয়।
এক হাদীসে আসিয়াছে, জমিনের যে অংশে আল্লাহর জিকির করা হয় সেই অংশ সাত তবক নীচ পর্যন্ত অন্যান্য অংশের উপর গর্ব করিয়া থাকে।

হাকিম তিরমিজি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহর জিকির দিল কে ভিজাইয়া দেয় এবং দিলের মধ্যে নম্রতা পয়দা করে। আর যখন দিল আল্লাহর জিকির হইতে খালি হয় তখন নফসের গরমি ও খাহেশাতের আগুনে শুকাইয়া শক্ত হইয়া যায় এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শক্ত হইয়া যাই। ফলে এই দিল ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবাদাত বন্দেগী হইতে রুখিয়া যাই । যদি এই অঙ্গগুলিকে টানিয়া সোজা করিতে চাও তাহা হইলে ভাঙিয়া যাইবে। যেমন কাঠকে ঝুকাইতে চাইলেও ঝুকে না শুধু কাটিয়া জ্বালাইবার উপযুক্ত থাকিয়া যাই।

আল্লাহর জিকিরে দূর হয় মানসিক অশান্তিঃ

পাপে হৃদয় কলুষিত হয়, কলবে ধরে জং, নষ্ট করে মানসিক প্রশান্তি, বাড়ায় হতাশা, বিষণ্নতা ও হাজারও দুর্ভাবনা।

কেন এমন হয়? নবীজি ইরশাদ করেন, বান্দা যখন পাপ করে তখন তার অন্তরের মধ্যে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর সে আবার পাপ করলে তার অন্তরে আরো দাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এভাবে তার পুরো অন্তর কালো দাগে ঢেকে যায়। (তিরমিজি: ৩৩৩৪)

কলব থেকে পাপের কালিমা দূর করার অন্যতম মাধ্যম হলো জিকির। জিকির মানুষের কলবকে করে পরিষ্কার এবং তাজা। দূর করে মানসিক বিষন্নতা ও পেরেশানি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, জেনে রাখ, জিকিরের মাধ্যমে মন শীতল এবং প্রশান্ত হয়। (সূরা রা'দ: ২৮)

প্রতাপশালী এবং ওপর মহলের একটু সুদৃষ্টি পাওয়ার জন্য মানুষ হরেক রকম চেষ্টা তদবির করে। অথচ তেমন কোন কষ্ট ছাড়াই জিকিরের মাধ্যমে মহাপ্রতাপশালী এবং সর্বশক্তিমানের নৈকট্য অর্জন করা যায়।

নবীজি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, বান্দা যখন আমার জিকির করে তখন আমি তার সাথে থাকি। বান্দা যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে আমিও তাকে অন্তরে স্মরণ করি। বান্দা কোনো মজলিসে আমার কথা আলোচনা করলে আমি তার চেয়ে উত্তম মজলিসে তার আলোচনা করি। (সহীহ মুসলিম: ২৬৭৫)

এছাড়া কুরআনে পাকে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদের স্মরণ করব। (সূরা বাকারা: ১৫২)

কেয়ামতের ভয়াবহতার কথা কমবেশি সবাই জানে। কঠিন সেই দিনে আরশের ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবেন। সেই বিপদক্ষনে যিকিরকারী ব্যক্তিরা আরশের শীতল ছায়াতলে ঠাঁই পাবে। নবীজি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন। তাদের একজন হলো, যে নিরিবিলি আল্লাহর জিকির করেছে এবং চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়েছে। (সহীহ বুখারী: ৬৪৭৯)

নবীজিকে একজন সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলামের বিধান তো অনেক। আমাকে এমন একটি বিষয় বলে দিন যার উপর আমি সর্বদা আমল করতে পারি। নবীজি বললেন, তোমার জিহবাকে আল্লাহর জিকিরে তরতাজা রাখ। (জামে তিরমিযী:৩৩৭৫)

অপর এক হাদিসে নবীজি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, বান্দা যতক্ষণ আমাকে স্মরণ করতে থাকে এবং আমার যিকিরের কারণে তার ঠোঁট নড়তে থাকে, ততক্ষণ আমি তার সাথে থাকি। অর্থাৎ আল্লাহর রহমত তার সাথে থাকে। (ইবনে মাজাহ- ৩৭৯২)

জিকিরের মজলিস অন্যসব মজলিস থেকে শ্রেষ্ঠ। ইবাদতের মজলিস আল্লাহর রহমত চাদরে আবৃত থাকে। নবীজির ইরশাদ করেন, যখন মানুষ আল্লাহর জিকির করে তখন ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখেন, আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয় এবং তাদের উপর সাকিনা নাযিল হয়, আর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের সামনে তাদের কথা আলোচনা করেন। (সহীহ মুসলিম: ৭০০)

কোন জিকির আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়,আমরা বেশি বেশি কোন জিকির করবঃ

•

নবীজি ইরশাদ করেন, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ আকবার এই চারটি জিকির আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয়। সহীহ বুখারী-৬৩০২

নবীজি বলেন, জান্নাতে প্রবেশ করার পর জান্নাতিরা দুনিয়ার কোনো জিনিসের জন্য আফসোস করবে না, শুধু এসময়টুকুর জন্য আফসোস করবে যা দুনিয়াতে আল্লাহর যিকির ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদিস: ১৬৭৪৬)

অতি উপকারী ও দামী জিনিসের কদরও করতে হয় বেশি। না হয় এর দ্বারাই ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। তাই অতীব ফজিলতপূর্ণ জিকির থেকে বিমুখতার পরিণতিও খুব কঠিন।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে আল্লাহ তার জন্য শয়তান নিয়োজিত করে দেই। অতঃপর সে তার সঙ্গী হয়। আর শয়তান মানুষকে সৎ পথে বাধা দান করে অথচ মানুষ মনে করে যে সে সৎ পথেই আছে। (সূরা যুখরুফ-৩৬)

কুরআনের অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে, যে আল্লাহর জিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জীবিকা সংকীর্ণ হয়ে যাবে এবং তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উঠানো হবে। (সূরা তহা-১২৫)

আসুন কুরআন তেলাওয়াত, ফরজ নফলসহ বিভিন্ন ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর জিকিরে মনোযোগী হই। মনকে করি সজীব ও প্রশান্ত। জীবনে আনি প্রফুল্লতা ও সুখ। সিক্ত হই বরের রহমত শিশিরে। দূর করি সব মানসিক দুর্ভাবনা।

জিকির মানে আল্লাহতায়ালার স্মরণ। আল্লাহর জিকির সবচেয়ে বড় ও সর্বোত্তম ইবাদত; কেননা, আল্লাহতায়ালার স্মরণই হচ্ছে যাবতীয় ইবাদতের প্রধান ও অন্যতম লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা কোরআনে কারিমে ইরশাদ করেন, 'আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।

জিকির সম্পর্কে মহান আল্লাহ অভিব্যক্তিঃ

আল্লাহ পাক বলেন, আমি কোন সৃষ্টিকে অযথা সৃষ্টি করেনি এবং কোন হেকমত ও রহস্য ছাড়া সৃষ্টি করেনি। বরং আমি এ জন্যই সকল মাখলুক সৃষ্টি করেছি যেন আমার যিকির করা হয় ও আমার ইবাদত করা হয়। সুতরাং যখন এই পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের যিকির করা হবে না এবং তাঁর ইবাদত করা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন এই সুন্দর পৃথিবী ধ্বংশ হয়ে যাবে এবং কেয়ামত কায়েম হয়ে যাবে।

হযরত আল্লামা মাজহারী (রহ.) বলেন, এই হাদীস দ্বারা দলীল পাওয়া গেল নেককার ওলামাগণের বরকত জ্বিন ও মানুষসহ সকল জগতবাসী ভোগ করে। এমনকি জানোয়ার ও গাছপালা এবং মাটি ও পাথর সকলেই ভোগ করে। সুতরাং প্রমাণিত হল, আল্লাহ নামের যিকির এই পৃথিবীর জন্য রূহ ও আত্মা স্বরূপ। এই যিকির দ্বারাই এ পৃথিবী টিকে আছে ও টিকে থাকবে। আল্লাহ বেশী জানেন। (ফতহুল মূলহিম ১ খ. ২৯০ পৃ.)

এ হাদীসে বলা হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত জমিনে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' শব্দের যিকির করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত কায়েম করবেন না। অন্য হাদীসে আছে,

যতক্ষণ পর্যন্ত জমিনে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলনেওয়ালা একজন ব্যক্তি বাকি থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ কেয়ামত কায়েম করবেন না। এ হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায়, শুধু 'আল্লাহ' শব্দের যিকির করা শুধু বৈধ নয় বরং গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের বিষয়। যে ইবাদতের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবী টিকে আছে। কারণ আল্লাহ পাক কুরআন পাকে বলেন, وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ অর্থ : মানুষ ও জ্বিন জাতিকে আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত আয়াত ৫৬)

সদা সর্বদা জিকিরের ফজিলতঃ

জিকির শব্দের অর্থ কোনো কিছু স্মরণ করা, বর্ণনা করা, মনে রাখা বা মনে করা ইত্যাদি। জিকরুল্লাহ বলতে আল্লাহকে স্মরণ করা, আল্লাহর কথা বর্ণনা করা, আল্লাহকে মনে রাখা বোঝায়। মানুষ হিসেবে আমাদের উচিত আমাদের স্রষ্টাকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করা। অথচ আমরা খুব কমই স্রষ্টাকে স্মরণ করি এবং কৃতজ্ঞতা কমই প্রকাশ করি। স্রষ্টাকে স্মরণের অনেক রকম অবলম্বন রয়েছে। এসবের মধ্যে জিকির, হোক মনে মনে কিংবা মুখে মুখে, হচ্ছে একটি উপায়। যার মাধ্যমে আমরা স্রষ্টাকে দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে ফাঁকেই স্মরণ করতে পারি। প্রতিদিনের আমলের খুব বড় একটা অংশ হচ্ছে জিকির বা অনবরত পাঠ। জিকিরের অনেক বেশি ফজিলত রয়েছে।
দুনিয়ার বস্তুগত সামগ্রিক বিষয়ের মধ্যে জিকিরের গুরুত্ব অনেক বেশি। রাসূল সা: বলেন, 'দুনিয়াটা অভিশপ্ত এবং এর মধ্যস্থিত সব কিছুই অভিশপ্ত। তবে আল্লাহর জিকির, জিকিরের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়, আলেম (জ্ঞানী) ও জ্ঞানার্জনকারী (অভিশপ্ত নয়)' (সহিহ তারগিব ওয়াত তাহরিব-৭৪)।

আল্লাহর জিকির ছাড়া বাকি সব কিছুকেই অভিশপ্ত, সুবহান আল্লাহ। আল্লাহকে যদি কেউ মন দিয়ে ডাকে তবে সেই ডাকে নিশ্চয়ই কোনো গাফিলতি বা ভ্রষ্টতা থাকে না। আর এর জন্যই দুনিয়ার যাবতীয় সব বিষয় থেকে জিকির একটি শ্রেষ্ঠ কাজ।

আল-কুরআন আমাদের বারবার আল্লাহর জিকিরের গুরুত্ব বুঝিয়েছে। কুরআনে জিকিরের নির্দেশ দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, 'যারা দাঁড়িয়ে-বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে

স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং (বলে,) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এ নিরর্থক সৃষ্টি করোনি। তুমি পবিত্র। তুমি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো' (সূরা ইমরান-১৯১)।

এর অর্থ হলো বিস্ময়কর এই সৃষ্টি এবং আল্লাহর মহা কুদরত দেখেও যে ব্যক্তি মহান স্রষ্টার পরিচয় লাভ করতে পারে না, সে প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানীই নয়। দ্বিতীয় আয়াতে জ্ঞানীদের আল্লাহর জিকর করার স্পৃহা এবং আসমান ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে তাদের চিন্তা ও গবেষণা করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

হাদিসেও রাসূল সা: বলেছেন, 'দাঁড়িয়ে নামাজ পড়। যদি দাঁড়িয়ে পড়তে না পারো, তাহলে বসে বসে পড়। আর যদি বসে বসে পড়তে না পারো, তবে পার্শ্বদেশে শুয়ে শুয়ে পড়' (বুখারি-১১১৭)।

এ ধরনের লোক যারা সবসময় আল্লাহর জিকর করেন ও তাঁকে স্মরণে রাখেন এবং আসমান ও জমিনের সৃষ্টি ও তার রহস্য ও যুক্তিসমূহ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করেন, তারা বিশ্বস্রষ্টার মহত্ত্ব ও মহাশক্তি, তার জ্ঞান ও এখতিয়ার এবং তার রহমত ও প্রতিপালকত্ব সম্পর্কে সঠিক পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হন। ফলে আপনা-আপনিই তাদের মুখ ফুটে বেরিয়ে আসে, বিশ্বের প্রতিপালক এই বিশাল পৃথিবীকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি; বরং এর উদ্দেশ্য হলো বান্দাদেরকে পরীক্ষা করা। যে বান্দা পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করতে পারবে, সে লাভ করবে চিরস্থায়ী জান্নাতের নিয়ামত। আর যে পরীক্ষায় ব্যর্থ হবে, তার জন্য হবে জাহান্নামের আজাব। এই জন্যই তারা (জ্ঞানীজন) জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়াও করে থাকেন।

জাকির বা আল্লাহর জিকিরকারীকে রাসূল সা: মুফার্রিদ বলেছেন। রসূলুল্লাহ সা: মক্কার পথে চলতে থাকেন। অতঃপর 'জুমদন' নামে একটি পর্বতের কাছে গেলেন। এরপর তিনি বললেন, 'তোমরা এ জুমদান পর্বতে সফর করো। মুফার্রিদরা অগ্রগামী হয়েছে। মানুষরা প্রশ্ন করল, মুফার্রিদ কারা! হে আল্লাহর রাসূল সা:? তিনি বললেন, 'বেশি বেশি আল্লাহর জিকিরে নিয়োজিত পুরুষ ও নারী' (সহিহ মুসলিম-৬৭০১)।

ইসলামের মধ্যে নিবদ্ধ থাকার উপায়ঃ

অতিরিক্ত জিকির করার মাধ্যমে ইসলামের মাঝে শক্তভাবে নিবদ্ধ থাকা সম্ভব। কারণ বান্দা যখন অনবরত আল্লাহকে ডাকবে এবং স্মরণ করবে, তখন অন্যান্য সব চিন্তা খুব কমই আসবে। এর একটা বিশেষ ফজিলত অবশ্যই রয়েছে। জনৈক সাহাবি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য ইসলামের শরিয়তের বিষয়াদি অতিরিক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং আমাকে এমন একটি বিষয় জানান, যা আমি শক্তভাবে আঁকড়ে থাকতে পারি। তিনি বললেন, 'সর্বদা তোমার জিহ্বা যেন আল্লাহ তায়ালার জিকিরে সিক্ত থাকে' (ইবনে মাজাহ-৩৭৯৩)।

রাসূল সা: বলেন, 'আল্লাহ তায়ালার এক গ্রুপ ভ্রাম্যমাণ বর্ধিত ফেরেশতা রয়েছে। তারা জিকিরের বৈঠকগুলো সন্ধান করে বেড়ায়। তারা যখন কোনো জিকিরের বৈঠক পায় তখন সেখানে তাদের (জিকিরকারীদের) সাথে বসে যায়। আর পরস্পর একে অপরকে বাহু দ্বারা ঘিরে ফেলে। এমনকি তারা তাদের মাঝে ও নিকটতম আকাশের ফাঁকা জায়গা পূরণ করে ফেলে। আল্লাহর জিকিরকারীরা যখন পৃথক হয়ে যায় তখন তারা আকাশমণ্ডলীতে আরোহণ করে। তিনি বলেন, 'তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কোথা থেকে এসেছ? অথচ তিনি তাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অবহিত। তখন তারা বলতে থাকে, আমরা ভূমণ্ডলে অবস্থানকারী আপনার বান্দাদের কাছ থেকে এসেছি, যারা আপনার তাসবিহ পড়ে, তাকবির পড়ে, তাহলিল বলে (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর) জিকির করে, আপনার প্রশংসা করে এবং আপনার কাছে তাদের প্রত্যাশিত বিষয় প্রার্থনা করে। তখন আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দারা আমার কাছে কী প্রার্থনা করে?' তারা বলেন, তারা আপনার কাছে আপনার জান্নাত প্রত্যাশা করে। তিনি বলেন, 'তারা কি আমার জান্নাত প্রত্যক্ষ করেছে?' তারা বলেন, না; হে আমাদের প্রভু! তিনি বলেন, 'তারা যদি আমার জান্নাত প্রত্যক্ষ করত তাহলে তারা কী করত?' তারা বলেন, তারা আপনার কাছে আশ্রয় চায়। তিনি বলেন, 'কী বিষয় থেকে তারা আমার কাছে আশ্রয় চায়?' তারা বলেন, হে আমাদের প্রভু! আপনার জাহান্নাম থেকে (মুক্তির জন্য)। তিনি বলেন, 'তারা কি আমার জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করেছে?' তারা বলেন, না; তারা প্রত্যক্ষ করেনি। তিনি বলেন, 'তারা যদি আমার জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করত তাহলে কী করত?' তারা বলেন, তারা আপনার কাছে

ক্ষমা প্রর্থনা করে। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ বলবেন, ‘আমি তাদের মার্জনা করে দিলাম এবং তারা যা প্রার্থনা করছিল আমি তা তাদের প্রদান করলাম আর তারা যা থেকে আশ্রয় চেয়েছিল আমি তা থেকে তাদের মুক্তি দিলাম। অতঃপর তারা বলবে, হে আমাদের রব! তাদের মাঝে তো অমুক পাপি বান্দা ছিল, যে তাদের সাথে বৈঠকের কাছ দিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে বসেছিল। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ বলবেন, ‘আমি তাকেও মাফ করে দিলাম। তারা তো এমন একটি কওম যাদের সঙ্গীরা দুর্ভাগা হয়না(মুসলিম শরীফ-৬৭৩২)

সব ইবাদতের রুহ হলো জিকিরঃ

সব ইবাদতের রুহ হচ্ছে আল্লাহর জিকির। আল্লাহতায়ালা বান্দাদের সর্বাবস্থায় অধিকহারে তাঁর জিকির করার নির্দেশ দিয়েছেন।

যেমন-আল্লাহতায়ালা বলেন, হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর এবং সকাল সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর। এখানে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা বলতে জিকিরকে উদ্দেশ করা হয়েছে। (সূরা আহজাব : ৪১-৪২)। সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকির করতে হবে দাঁড়িয়ে, বসে এমনকি শুয়ে যেভাবে পারা যায়, আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে। যেমন-আল্লাহতায়ালা বলেন, যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টি বিষয়ে (তারা বলে) হে পরওয়ারদিগার! এসব নিয়ে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। (সূরা আলে ইমরান : ১৯১)।

আল্লাহর জিকিরকারী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত জীবিত ব্যক্তিদের মতো। যারা আল্লাহর জিকির করে না, তাদের কলব মরে যায় যদিও তারা জীবিত থাকে। জিকিরের মাধ্যমে মানুষের মরা কলব জিন্দা হয়। অন্তরে আল্লাহতায়ালার ভয় জাগ্রত হয়। বান্দা আল্লাহতায়ালার আনুগত্যের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। লোভ-লালসার প্রতি চরম ঘৃণা সৃষ্টি হয়।

আল্লাহতায়ালা বলেন, যারা ইমানদার তারা এমন লোক যে, যখন আল্লাহর জিকির করা হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয় তখন তাদের ইমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় প্রভুর ওপর ভরসা করে। (সূরা আনফাল : ২)।

কখনো জিকির থেকে গাফেল হওয়া যাবে না। জিকির থেকে গাফেল হলে সৃষ্টির ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নানা বিপদাপদ নাজিল হয়ে থাকে। যারা জিকির থেকে গাফেল হয় তাদের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে হাদিসে কুদসিতে আল্লাহতায়ালা বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করে এবং যে আল্লাহর জিকির করে না তাদের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃতদের মতো। (বুখারি : ৬৪০৭, মুসলিম : ৭৭৯)।

জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে বান্দার যোগসূত্র তৈরি হয়। বান্দা আল্লাহর দয়া ও মাগফিরাত লাভের যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। আল্লাহতায়ালা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা বলেন, তোমরা যদি আমার হুকুমের আনুগত্যের মাধ্যমে আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদের সওয়াব ও মাগফিরাতদানের মাধ্যমে স্মরণ করব। (সূরা বাকারা : ১৫২)।

শয়তান মানুষকে পাপ কাজে লিপ্ত করে। আর পাপের কারণে মানুষের অন্তরে কালিমা সৃষ্টি হয়। এই কালিমা দূরীভূত হয় আল্লাহর জিকির দ্বারা। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত; রাসূল (সা.) এরশাদ করেন, প্রত্যেক বস্তু পরিষ্কার করার উপকরণ আছে। আর অন্তরের ময়লা পরিষ্কার করার উপকরণ হলো আল্লাহর জিকির। (আত-তারগিব ওয়াত তারহিব : ২/৩২৭)।

হজরত সাহল ইবনে হানজালা (রা.) সূত্রে বর্ণিত; রাসূল (সা.) এরশাদ করেন, যেসব লোক কোনো মজলিসে বসে আল্লাহর জিকির করে যখন মজলিস থেকে উঠে তখন তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়, তোমরা ওঠ। আল্লাহতায়ালা তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তোমাদের গুনাহগুলো নেকিতে পরিবর্তন করে দিয়েছেন।

(আত-তারগিব ওয়াত তারহিব : ২/৩৩৪)। জিকিরকারীকে ফেরেশতারা খুঁজতে থাকেন। যেখানে আল্লাহর জিকির করা হয় সেখানে ফেরেশতাদের আগমন ঘটে। জিকিরকারী বান্দার সঙ্গে বসে তারাও আল্লাহর জিকির করেন।

হজরত জাবির (রা.) সূত্রে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূল (সা.) আমাদের থেকে বের হলেন এবং বললেন, হে লোক সকল! আল্লাহর একদল ফেরেশতা আছেন। তারা কোনো জিকিরের মজলিস পেলে সেখানে অবস্থান করেন। অতঃপর তোমরা জান্নাতের বাগানের ফল খাও। আমরা বললাম, জান্নাতের বাগান কোথায়? হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, জিকিরের মজলিসগুলো জান্নাতের বাগান। (আল-মাজরুহাইন : ২/৫২, আবি ইয়ালা : ২১৩৮)।

সর্বোত্তম জিকির কোনটি তা নিয়ে বিভিন্ন রেওয়াতে পরিলক্ষিত হয়। কোনো কোনো রেওয়াতে আছে সর্বোত্তম জিকির হলো, কালিমায়ে তাইয়্যেবাহ। কারণ এর দ্বারা অন্তর পরিষ্কার হয়। কোনো রেওয়াতে আছে, তেলাওয়াত কুরআন হলো সর্বোত্তম জিকির।

কেননা, এতে একটি হরফে দশটি নেকি পাওয়া যায়। কোনো রেওয়াতে আছে, তাওবা ও ইস্তেগফার হলো উত্তম জিকির। এতে মুসিবত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, গুনাহ মাফ হয় এবং রিজিকে বরকত হয়। কোনো রেওয়াতে আছে-সর্বোত্তম জিকির হলো দরুদ শরিফ পাঠ। কোনো রেওয়াতে আছে, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম-এ দোয়াটি সর্বোত্তম জিকির।

কেননা, এর দ্বারা কেয়ামত দিবসে মিজান ভারী হবে। কোনো রেওয়াতে আছে-উত্তম জিকির হলো তাসবিহে ফাতেমি। অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৩ বার প্রত্যহ বাদ ফজর ও মাগরিব। (মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী, তাফসিরে নঈমী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৯)

আল্লাহর যিকিরের সুফল ও উপকারিতাঃ

আল্লাহর পবিত্র নামের যে বরকত ও লযযত এবং স্বাদ ও আনন্দ রয়েছে তা অন্য কিছুতে নেই। আল্লাহর যিকির এমন এক শক্তি, যা দুর্বলকে সবল করে এবং সকল বিপদে দৃঢ়পদ রাখে। কারণ আল্লাহর স্মরণকারীর বিশ্বাস এই যে, সব কিছু আল্লাহর হুকুমেই হয় এবং আল্লাহর কোনো ফয়সালা বান্দার জন্য অশুভ নয়। আল্লাহর ফয়সালা মেনে নেওয়ার মাঝেই বান্দার কামিয়াবি ও কল্যাণ। কুরআন মজীদে আল্লাহর যিকির বেশি বেশি করতে বলা হয়েছে। অন্য কোনো ইবাদত সম্পর্কে এমন কথা বলা হয়নি। কুরআন মজীদে আল্লাহর যিকির বেশিবেশি করতে বলা হয়েছে। কারণ আল্লাহর যিকির তথা আল্লাহর স্মরণ এমন এক বিষয়, যা মানুষকে সব ধরনের গুনাহ থেকে রক্ষা করে এবং শরীয়তের হুকুম মোতাবেক চলতে সাহায্য করে। উপরন্তু তা এত সহজ যে, এর জন্য আলাদা করে বেশি সময় ব্যয় করার কিংবা অন্যান্য কাজ স্থগিত রাখার প্রয়োজন হয় না।

আল্লাহর যিকির হচ্ছে যাবতীয় ইবাদতের রূহ। আবু ওসমান নাহদী রাহ. বলেন, কুরআন মজীদের ওয়াদা অনুযায়ী যখন কোনো বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করে তখন আল্লাহ তাকে স্মরণ করেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং শোকর গোযারি কর, না-শোকরি করো না।-সূরা বাকারা : ১৫২

সুতরাং আমরা যখন আল্লাহর যিকিরে মশগুল হই তখন একথা স্মরণ করা কর্তব্য যে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলাও আমাদেরকে স্মরণ করছেন। এতে যিকিরের স্বাদ ও লযযত বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। যিকিরের ফযীলত সম্পর্কিত কিছু আয়াত ও হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হল।

এক. কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন, (তরজমা) আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলতা অর্জন কর।-সূরা আনফাল : ৪৫

দুই. অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, (তরজমা) যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্বরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়, জেনে রাখ আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।-সূরা রা'দ : ২৮

তিন. আরো বলা হয়েছে, (তরজমা) যারা ঈমানদার তারা এমন যে যখন তাদের সামনে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে।-সূরা আনফাল : ২

চার. আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, যাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয় আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে।-সূরা হজ্ব : ৩৫

পাঁচ. অন্য আয়াতে বলেন, (তরজমা) আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ।-সূরা আনকাবুত : ৪৫

ছয়. আল্লাহর অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও যিকিরকারী নারী, তাদের জন্য আল্লাহর প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।-সূরা আহযাব : ৩৫

সাত. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।-সূরা আহযাব : ৪১

আট. আরো বলেছেন, (তরজমা) স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায়।-সূরা আরাফ : ২০৫

নয়. মুমিনদের সর্ম্পকে বলেছেন, যারা আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় এবং চিন্তা-ভাবনা করে আসমান যমিন সৃষ্টির বিষয়ে। হে আমাদের প্রতিপালক! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি।-সূরা আলে ইমরান : ১৯৯

দশ. মুনাফিকদের বিষয়ে বলেছেন, যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন তারা শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।-সূরা নিসা : ১৪২

এগার. আরো বলেন, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ।-সূরা আহযাব : ২০

বার. অন্য আয়াতে বলেন, যে তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে অতপর নামায আদায় করে।-সূরা আ'লা : ১৫

এ জাতীয় আরো আয়াতে যিকিরের কথা বলা হয়েছে। উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

এবার কিছু হাদীস পেশ করা হল।

এক. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করতেন।-সহীহ মুসলিম ১/২৮২; সুনানে আবু দাউদ, পৃষ্ঠা ৪

দুই. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি বান্দার সাথে ঐরূপ ব্যবহার করি যেরূপ সে আমার প্রতি ধারণা রাখে। সে যখন আমাকে স্মরণ করে আমি তার সাথে থাকি। সে যদি আমাকে অন্তরে স্মরণ করে আমিও তাকে অন্তরে স্মরণ করি। সে যদি কোনো মজলিসে আমার কথা আলোচনা করে তবে আমি তার চেয়ে উওম মজলিসে তার আলোচনা করি।-সহীহ বুখারী ২/৭৪০৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৬৭৫

তিন. হযরত আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে তার প্রতিপালককে স্মরণ করে আর যে করে না তাদের দৃষ্টান্ত হল জীবিত ও মৃতের মতো। (অর্থাৎ যে আল্লাহকে স্মরণ করে সে জীবিত। আর যে স্মরণ করে না সে মৃত)।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬৪০৭; মুসলিম, হাদীস : ৭৭৯

চার. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার পথে জুমদান পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে চলছিলেন, তখন তিনি বললেন, তোমরা চলতে থাক এই যে জুমদান পাহাড়। মুফাররিদরা অগ্রগামী হয়েছে। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুফাররিদরা কারা? তিনি বললেন, ঐসব নারী ও পুরুষ, যারা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।-সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৬৭৬

পাঁচ. হযরত আবূ দারদা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি জিনিসের কথা বলব না, যা তোমাদের সমস্ত আমলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সবচেয়ে পবিত্র; তোমাদের মর্যাদাকে আরো বুলন্দকারী; আল্লাহর রাস্তায় সোনা-রুপা খরচ করা থেকে এবং জিহাদের ময়দানে শত্রুর প্রাণ নেওয়া ও শত্রুর হাতে প্রাণ দেওয়া থেকেও উত্তম? সাহাবারা বললেন, অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, তা হল আল্লাহর যিকির।-জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩৩৭৭; ইবনে মাজাহ, হাদীস : ৩৭৯০

ছয়. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন," আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন। ... ঐ ব্যক্তি, যে একান্তে আল্লাহকে স্মরণ করেছে এবং তার চোখ থেকে অঝরে পানি পড়ে।" -(মিশকাত,বুখারী,মুসলিম)

জিকিরই কলবকে সজীব রাখার পথঃ

হজরত আবু দারদা (রা.) বলেন, 'যাদের জিহ্বা আল্লাহর জিকিরে তরতাজা থাকবে, তারা হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'প্রতিটি জিনিসের মরিচা পরিষ্কার করার যন্ত্র আছে, আর অন্তরের মরিচা পরিষ্কার করার যন্ত্র হলো আল্লাহর জিকির।' (বায়হাকি)

অবসর ও আরামের সময় জিকির করতে থাকলে বিপদে-আপদে তা কাজে আসে। দিনে-রাতে, সুস্থতা-অসুস্থতায়, হাঁটাচলায়, কাজের ফাঁকে সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকির অন্তরে রাখা প্রয়োজন। জিকির অন্তরে শান্তি ও প্রশস্ততা এনে দেয়।

সকাল সন্ধ্যায় তাসবিহ পাঠ করাঃ

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর জিকির করার জন্য মুমিনদের নির্দেশ দিয়েছেন। "হে মুমিনগণ! তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করো এবং সকাল-সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো (সুরা আহজাব: ৪১-৪২)।

জিকিরবিমুখ ব্যক্তির পরিণতি খুবই ভয়াবহ। 'যে ব্যক্তি আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্যই তার জীবনযাপন হবে সংকুচিত; তাকে কেয়ামতের দিন উঠাব অন্ধ করে' (সুরা ত্বহা: ১২৪)। জিকিরকারী এবং জিকির থেকে বিমুখ—এমন ব্যক্তিদের পার্থক্য বোঝাতে বিশ্বনবী (স.) ইরশাদ করেছেন—

'যারা আল্লাহর জিকির করে এবং যারা করে না, তাদের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মতো।'(সহিহ বুখারি: ৬৪০৭)
জিকিরের গুরুত্ব কতটুকু, তা উল্লেখিত আয়াত ও হাদিস থেকেই অনুমান করা যায়। ভিন্ন ভিন্ন কালেমা সম্বলিত জিকিরের অনেক বর্ণনা রয়েছে হাদিসে। তারমধ্যে কিছু জিকির এমন, যেগুলো পাঠ করা খুবই সহজ, কিন্তু সওয়াব অফুরন্ত। যেমন—

১) প্রতিদিন ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহ' পাঠ করলে ১হাজার সওয়াব লেখা হয় এবং ১হাজার গুনাহ মাফ করা হয়। (সহিহ মুসলিম: ৪/২০৭৩)

২) 'আলহামদুলিল্লাহ' মিজানের পাল্লাকে ভারী করে এবং সর্বোত্তম দোয়া। (তিরমিজি: ৫/৪৬২; ইবনে মাজাহ: ২/১২৪৯; হাকিম: ১/৫০৩; সহিহ আল জামে: ১/৩৬২)

৩) ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ হলো সর্বোত্তম জিকির। (তিরমিজি: ৫/৪৬২; ইবনে মাজাহ: ২/১২৪৯; হাকিম: ১/৫০৩; সহিহ আল জামে: ১/৩৬২)

৪) ‘সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর’ পৃথিবীর সকলকিছুর চেয়ে আল্লাহর রাসুলের (স.) কাছে অধিক প্রিয়। (সহিহ মুসলিম: ৩/১৬৮৫; ৪/২০৭২)

৫) ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি’ প্রতিদিন ১০০ বার পাঠ করলে সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ (সগিরা) গুনাহ থাকলেও তাকে মাফ করে দেওয়া হবে। (সহিহ বুখারি: ৭/১৬৮; সহিহ মুসলিম ৪/২০৭১)

৬) নবী (স.) বলেন, ‘সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আজীম’ এই কালেমাগুলো জিহ্বায় উচ্চারণে সহজ, মিজানের পাল্লায় ভারী, দয়াময় আল্লাহর নিকট প্রিয়। (সহিহ বুখারি: ৭/১৬৮, সহিহ মুসলিম: ৪/২০৭২)

৭) যে ব্যক্তি ‘সুবহানাল্লাহিল আজীম ওয়াবিহামদিহি’ পাঠ করবে, প্রতিবারে তার জন্য জান্নাতে একটি করে খেজুরগাছ রোপন করা হবে। (তিরমিজি: ৫/৫১১; হাকিম: ১/৫০১; সহিহ আল-জামে: ৫/৫৩১; সহিহ তিরমিজি: ৩/১৬০)

৮) প্রিয়নবী (স.) বলেন, ‘লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ’ হচ্ছে জান্নাতের গুপ্তধনসমূহের মধ্যে একটি গুপ্তধন। (সহিহ বুখারি: ১১/২১৩; সহিহ মুসলিম: ৪/২০৭৬)

৯) রাসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, ‘সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ’ এই কালেমাগুলো হচ্ছে “অবশিষ্ট নেকআমলসমূহ”। (আহমদ (সহিহ-৫১৩; মাজমাউজ জাওয়ায়িদ: ১/২৯৭)

১০) নবী (স.) বলেন, যে আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি ১০বার রহমত বর্ষণ করবেন। তিনি (স.) আরও বলেন, যে আমার প্রতি সকালে ১০বার এবং বিকালে ১০বার দরুদ পাঠ করবে, সে কেয়ামতের দিন আমার শাফায়াত পাবে। (তাবারানি, মাজমাউজ জাওয়ায়িদ: ১০/১২০; সহিহ তারগিব ওয়াত তারহিব: ১/২৭৩)

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

`যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর জিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্ত হয়' (সুরা রাদ: ২৮)

হজরতআবু হুরায়রা বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন—'আল্লাহ তাআলা বলেন, বান্দা আমার ব্যাপারে যেমন ধারণা করবে, তেমনি আমাকে পাবে। আমাকে যখন সে স্মরণ করে আমি তার সঙ্গে থাকি। সে যদি আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে তাহলে আমিও তাকে আমার অন্তরে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে কোনো জনগোষ্ঠির নিকট স্মরণ করে তাহলে আমি তাকে তাদের চেয়ে উত্তম জনগোষ্ঠির নিকটে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে অর্ধ হাত এগিয়ে আসে তাহলে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে আসি। আর যদি সে এক হাত এগিয়ে আসে, তাহলে আমি তার দিকে হস্তদ্বয় প্রসারিত পরিমাণ এগিয়ে আসি। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে তাহলে আমি তার দিকে দ্রুত হেঁটে আসি। (বুখারি ও মুসলিম)

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে উল্লেখিত সহজ জিকিরগুলো আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

মহানবী (সা.)-এর কাছে যে জিকির সর্বাধিক প্রিয় ছিলঃ

জিকির আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম মাধ্যম। জিকিরে প্রশান্তি আসে। জিকিরে জান্নাত সুসজ্জিত হয়। জিকিরে বান্দার আমলনামাকে ভারী করে।

তাই মুমিনের উচিত, জিকিরের মাধ্যমে জিহ্বাকে তাজা রাখা। হাদিস শরিফে যেসব জিকিরের বর্ণনা এসেছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো, 'সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদু লিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার।'
নিম্নে এই জিকিরের কিছু বিশেষ ফজিলত তুলে ধরা হলো :

আল্লাহর প্রিয় কালাম : সামুরাহ ইবনে জুনদাব (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, আল্লাহর কাছে বেশি পছন্দনীয় কালাম চারটি। আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর, (এক) আল্লাহ ছাড়া আর উপাস্য নেই এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।

এগুলোর যেকোনো শব্দ দ্বারা তুমি আরম্ভ করো, এতে তোমার কোনো ক্ষতি নেই। (মুসলিম, হাদিস : ৫৪৯৪)
নবীজি (সা.)-এর প্রিয় জিকির : হাদিস শরিফে এই জিকিরকে শ্রেষ্ঠ জিকির আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই আমলটি নবীজি (সা.)-এর দৈনন্দিন আমলের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় আমল ছিল। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'সুবহানাল্লাহ ওয়াল-হামদু লিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' (আল্লাহ অতীব পবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) বলা আমার কাছে যেসব জিনিসের ওপর সূর্য উদিত হয় তা হতে বেশি পছন্দনীয়।

(তিরমিজি, হাদিস : ৩৫৯৭)
কোরআনের পর শ্রেষ্ঠ জিকির : হাদিসে আছে, কোরআনের পর চারটি সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্য আছে, যেগুলো কোরআনেরই বাক্য। তার যেকোনোটি দিয়ে শুরু করাতে তোমার ক্ষতি নেই, সুবহানাল্লাহ, ওয়ালহামদু লিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার। (মুসনাদে আহমদ)

এই জিকিরে গুনাহ মাফ হয় : আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) একটি শুকনা পাতাওয়ালা গাছের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর লাঠি দিয়ে তাতে আঘাত করলে হঠাৎ পাতাগুলো ঝরে পড়ে। অতঃপর তিনি বলেন, কোনো বান্দা 'আলহামদুলিল্লাহ', 'সুবহানাল্লাহ', এবং 'লাইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' (সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, আল্লাহ তাআলা অতি পবিত্র এবং আল্লাহ তাআলা ছাড়া সত্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি অতি মহান বললে তা তার গুনাহসমূহ এরূপভাবে ঝরিয়ে দেয় যেভাবে এ গাছের পাতাসমূহ ঝরে পড়েছে।

(তিরমিজি, হাদিস : ৩৫৩৩)
অন্য হাদিসে বলা হয়েছে, এই জিকির সকালে এক শবার করলে সাগরের ফেনাসম গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালের নামাজের পর এক শবার সুবহানাল্লাহ এবং এক শবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনাসম হয়। (নাসায়ি, হাদিস : ১৩৫৪)

জান্নাতে গাছ রোপণ হয় : আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি একটি চারাগাছ রোপণরত অবস্থায় রাসুল (সা.) তার কাছ দিয়ে যেতে জিজ্ঞেস করলেন, আবু হুরায়রা, কী রোপণ করছ? আমি বললাম, আমার একটি চারা রোপণ করছি। তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু রোপণের কথা বলে দেব না, যা তোমার জন্য এর চেয়েও উত্তম? তিনি বলেন, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসুল! তিনি বলেন, তুমি বলো, 'সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' (সমস্ত পবিত্রতা আল্লাহর, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, আল্লাহ মহান)। প্রতিবারে বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাতে একটি করে গাছ রোপিত হবে। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩৮০৭)

মিরাজের রাতে নবীজি (সা.) ইবরাহিম (আ.)-এর সঙ্গে দেখা করলে তিনি নবীজি (সা.)-কে বলেন, তিনি বলেন, হে মুহাম্মদ, আপনার উম্মতকে আমার সালাম পৌঁছে দিন এবং তাদের জানান যে, জান্নাতের জমিন অতীব সুগন্ধিসমৃদ্ধ এবং সেখানকার

পানি অত্যন্ত সুস্বাদু। তা একটি সমতল ভূমি এবং তার গাছপালা হলো ‘সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদু লিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।’ (তিরমিজি, হাদিস : ৩৪৬২)

জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল : আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, একদা রাসুল (সা.) বলেন, তোমরা তোমাদের ঢাল সংগ্রহ করো। তাঁরা বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল, কোনো শত্রু উপস্থিত হলো কি?’ তিনি বলেন, না। বরং জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল। তোমরা সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলো। যেহেতু এগুলো কিয়ামতের দিন অগ্রণী হয়ে, আজাব রোধক হয়ে, ক্রমাগতভাবে শুভ-পরিণাম হয়ে উপস্থিত হবে। আর এগুলোই হলো স্থায়ী সৎকর্ম। (শুআবুল ঈমান)

মিজানের পাল্লা ভারী হয় : রাসুল (সা.)-এর পশুরক্ষক আবি সালমা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি শুনেছেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, বাঃ! বাঃ! পাঁচটি জিনিস মিজানে কতই না ভারী! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ ও আলহামদু লিল্লাহ। আর নেক সন্তান, যে মারা গেলে মুসলিম (মা-বাপ) তাতে সওয়াব কামনা করে। (ইবনে হিব্বান ৮৩৩)

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে জিকিরের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার তাওফিক দান করুন।আমিন।

যে ৪ জিকিরে গাছের পাতার মত গুনাহ ঝরে যায়ঃ

আল্লাহর জিকির করার অনেক বাক্য-কালেমা রয়েছে। তবে চারটি বাক্য আল্লাহর অনেক পছন্দ। এ চারটি বাক্যের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করি, তার প্রশংসা করি, তার একত্ববাদের স্বীকারোক্তি দেই এবং তার বড়ত্ব-স্তুতি বর্ণনা করি। এ চারটি বাক্য মানুষের গুনাহগুলো ঝরিয়ে দেয় যেমন শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যায়।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, আল্লাহ তাআলা চারটি বাক্য নির্বাচন করেছেন- সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আল্লাহু আকবার। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ৮০১২)

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে- একবার নবী (সা.) গাছের একটি ডাল ধরে ঝাঁকি দিলেন, কোনো পাতা পড়লো না। তিনি আবার ঝাঁকি দিলেন; এবারও কোনো পাতা পড়লো না। তবে তৃতীয়বার ঝাঁকি দেওয়ার পর অনেকগুলো পাতা ঝররো। তখন নবীজী (সা.) বললেন, 'নিশ্চয় সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা- ইলা-হা ইল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলা- বান্দার গুনাহ ঝরিয়ে দেয়, যেমন (শীতকালে) গাছ তার পাতা ঝরায়। ' (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ১২৫৩৪)

বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে নিয়মিত নফল ইবাদত করা অনেকের পক্ষে হয়তো সম্ভব হয় না। কিন্তু যে কোনো জায়গায়, যে কোনো মুহূর্তে আল্লাহর প্রশংসায় তার জিকির করা অনেক সহজ। কোনো সময়ক্ষেপণ হয় না, কাজেও ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। এ ক্ষেত্রে উপরোক্ত বাক্য দুইটি অন্তত নিয়মিত পড়তে পারি। এতে আমাদের অজ্ঞাতে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবেন।

গুনাহ গাছের পাতার মতো ঝরার চার আমল

এক. سُبْحَانَ اللهِ : সুবহানাল্লাহ : আর আল্লাহ তাআলা অতি পবিত্র।

দুই. اَلْحَمْدَ لِلّٰهِ : আলহামদুলিল্লাহ : সব প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য।

তিন. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু : আর আল্লাহ তাআলা ব্যতিত সত্য কোনো মাবুদ নেই।

চার. وَاللهُ أَكْبَرُ : ওয়াল্লাহু আকবার : এবং তিনি অতি মহান।

সকালের দেয়া ও জিকিরঃ

সকালের দোয়া ও জিকির দিনের শুরুতে আল্লাহর জিকিরে রিজিকে বরকত হয়। দিনটি ভালো কাটে। সাধারণত এই জিকির ফজরের সময় থেকে সূর্য উঠা পর্যন্ত সময়ে করার কথা এসেছে।

সাধারণত এই জিকির ফজরের সময় থেকে নিয়ে সূর্য উঠা পর্যন্ত সময়ে করার কথা এসেছে।

সাধারণত এই জিকির ফজরের সময় থেকে নিয়ে সূর্য উঠা পর্যন্ত সময়ে করার কথা এসেছে।

মুফতি আবদুল্লাহ তামিম

৩ মিনিটে পড়ুন

সুরা আল-বাকারার ২৫৫ নম্বর আয়াত যাকে আয়াতুল কুরসি বলা হয়। যে ব্যক্তি সকালে তা বলবে সে বিকেল হওয়া পর্যন্ত জিন ও শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয়ে থাকবে, আর যে ব্যক্তি বিকেলে তা বলবে সে সকাল হওয়া পর্যন্ত জিন ও শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয়ে থাকবে।

রসুল সা. বলেন, যে ব্যক্তি সকাল ও বিকেলে ‘কুল হুআল্লাহু আহাদ’ (সুরা ইখলাস), ‘সুরা ফালাক’ ও ‘সুরা নাস’ তিনবার করে বলবে, এটাই তার সবকিছুর জন্য যথেষ্ট হবে। (তিরমিজি ৩/১৮২)

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ উচ্চারণ: আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তার নিকটই তওবা করছি। (প্রতি দিন ১০০ বার) (বুখারি ৬৩০৭, মুসলিম ২৭০২)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نافِعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নি আস্‌আলুকা ‘ইলমান না-ফি‘আন্ ওয়া রিয্‌কান ত্বায়্যিবান ওয়া ‘আমালান মুতাক্বাব্বালান।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করি। এটি ফজর নামাজের সালাম ফিরানোর পর পড়বে। (ইবন মাজাহ ৯২৫)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير উচ্চারণ: লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মূলকু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ইয়ুহ্‌য়ী ওয়াইয়ূমীতু ওয়াহুয়া ‘আলা কুল্লি শাই’ইন ক্বাদির)। অর্থ: একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই, তার কোনো শরিক নেই, রাজত্ব তারই এবং সকল প্রশংসা তাঁর। তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। ১০ বার করে পড়বে। (তিরমিজি ৩৪৭৪)

ভোর সকালে যে দোয়া করবে

.اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ‘আ-ফিনী ফী বাদানী, আল্লা-হুম্মা ‘আ-ফিনী ফী সাম্‘ঈ আল্লা-হুম্মা ‘আ-ফিনী ফী বাসারী। লা ইলা-হা ইল্লা আনতা। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘উযু বিকা মিনাল কুফরি ওয়াল-ফাক্বরি ওয়া আ‘উযু বিকা মিন ‘আযা-বিল ক্বাবরি, লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা)। (৩ বার)

হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার শরীরে। হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার শ্রবণশক্তিতে। হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার দৃষ্টিশক্তিতে। আপনি ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই।

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কুফরি ও দারিদ্র্য থেকে। আর আমি আপনার আশ্রয় চাই কবরের আজাব থেকে। আপনি ছাড়া আর কোনো হক্ক ইলাহ নেই। (৩ বার) আবু দাউদ ৫০৯২, আহমাদ ২০৪৩০, বুখারি)

حَسْبِيَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيهِ تَوَكَّلتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ উচ্চারণ: হাসবিয়াল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুয়া, ‘আলাইহি তাওয়াক্কালতু, ওয়াহুয়া রব্বুল আরশিল আজিম) (৭ বার) অর্থ: আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোনো হক্ব ইলাহ নেই। আমি তার উপরই ভরসা করি। আর তিনি মহান আরশের রব্ব। (আবু দাউদ)

যে ব্যক্তি দোয়াটি সকালবেলা সাতবার এবং বিকেলবেলা সাতবার বলবে তার দুনিয়া ও আখেরাতের সব চিন্তাভাবনার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট হবেন।

কিছু সহজ জিকিরঃ

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর জিকির করার জন্য মুমিনদের নির্দেশ দিয়েছেন। "হে মুমিনগণ! তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করো এবং সকাল-সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো (সুরা আহজাব: ৪১-৪২)।

জিকিরবিমুখ ব্যক্তির পরিণতি খুবই ভয়াবহ। ‘যে ব্যক্তি আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্যই তার জীবনযাপন হবে সংকুচিত; তাকে কেয়ামতের দিন উঠাব অন্ধ করে’ (সুরা ত্বহা: ১২৪)। জিকিরকারী এবং জিকির থেকে বিমুখ—এমন ব্যক্তিদের পার্থক্য বোঝাতে বিশ্বনবী (স.) ইরশাদ করেছেন—

‘যারা আল্লাহর জিকির করে এবং যারা করে না, তাদের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মতো।’(সহিহ বুখারি: ৬৪০৭)
জিকিরের গুরুত্ব কতটুকু, তা উল্লেখিত আয়াত ও হাদিস থেকেই অনুমান করা যায়। ভিন্ন ভিন্ন কালেমা সম্বলিত জিকিরের অনেক বর্ণনা রয়েছে হাদিসে। তারমধ্যে কিছু জিকির এমন, যেগুলো পাঠ করা খুবই সহজ, কিন্তু সওয়াব অফুরন্ত। যেমন—

১) প্রতিদিন ১০০ বার ‘সুবহানাল্লাহ’ পাঠ করলে ১হাজার সওয়াব লেখা হয় এবং ১হাজার গুনাহ মাফ করা হয়। (সহিহ মুসলিম: ৪/২০৭৩)

২) ‘আলহামদুলিল্লাহ’ মিজানের পাল্লাকে ভারী করে এবং সর্বোত্তম দোয়া। (তিরমিজি: ৫/৪৬২; ইবনে মাজাহ: ২/১২৪৯; হাকিম: ১/৫০৩; সহিহ আল জামে: ১/৩৬২)

৩) ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ হলো সর্বোত্তম জিকির। (তিরমিজি: ৫/৪৬২; ইবনে মাজাহ: ২/১২৪৯; হাকিম: ১/৫০৩; সহিহ আল জামে: ১/৩৬২)

৪) ‘সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর’ পৃথিবীর সকলকিছুর চেয়ে আল্লাহর রাসুলের (স.) কাছে অধিক প্রিয়। (সহিহ মুসলিম: ৩/১৬৮৫; ৪/২০৭২)

৫) ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি’ প্রতিদিন ১০০ বার পাঠ করলে সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ (সগিরা) গুনাহ থাকলেও তাকে মাফ করে দেওয়া হবে। (সহিহ বুখারি: ৭/১৬৮; সহিহ মুসলিম ৪/২০৭১)

৬) নবী (স.) বলেন, ‘সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আজীম’ এই কালেমাগুলো জিহ্বায় উচ্চারণে সহজ, মিজানের পাল্লায় ভারী, দয়াময় আল্লাহর নিকট প্রিয়। (সহিহ বুখারি: ৭/১৬৮, সহিহ মুসলিম: ৪/২০৭২)

৭) যে ব্যক্তি ‘সুবহানাল্লাহিল আজীম ওয়াবিহামদিহি’ পাঠ করবে, প্রতিবারে তার জন্য জান্নাতে একটি করে খেজুরগাছ রোপন করা হবে। (তিরমিজি: ৫/৫১১; হাকিম: ১/৫০১; সহিহ আল-জামে: ৫/৫৩১; সহিহ তিরমিজি: ৩/১৬০)

৮) প্রিয়নবী (স.) বলেন, ‘লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ’ হচ্ছে জান্নাতের গুপ্তধনসমূহের মধ্যে একটি গুপ্তধন। (সহিহ বুখারি: ১১/২১৩; সহিহ মুসলিম: ৪/২০৭৬)

৯) রাসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, ‘সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ’ এই কালেমাগুলো

হচ্ছে “অবশিষ্ট নেকআমলসমূহ”। (আহমদ (সহিহ-৫১৩; মাজমাউজ জাওয়ায়িদ: ১/২৯৭)

১০) নবী (স.) বলেন, যে আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি ১০বার রহমত বর্ষণ করবেন। তিনি (স.) আরও বলেন, যে আমার প্রতি সকালে ১০বার এবং বিকালে ১০বার দরুদ পাঠ করবে, সে কেয়ামতের দিন আমার শাফায়াত পাবে। (তাবারানি, মাজমাউজ জাওয়ায়িদ: ১০/১২০; সহিহ তারগিব ওয়াত তারহিব: ১/২৭৩)

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

`যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর জিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্ত হয়’ (সুরা রাদ: ২৮)

হজরতআবু হুরায়রা বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন—‘আল্লাহ তাআলা বলেন, বান্দা আমার ব্যাপারে যেমন ধারণা করবে, তেমনি আমাকে পাবে। আমাকে যখন সে স্মরণ করে আমি তার সঙ্গে থাকি। সে যদি আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে তাহলে আমিও তাকে আমার অন্তরে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে কোনো জনগোষ্ঠির নিকট স্মরণ করে তাহলে আমি তাকে তাদের চেয়ে উত্তম জনগোষ্ঠির নিকটে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে অর্ধ হাত এগিয়ে আসে তাহলে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে আসি। আর যদি সে এক হাত এগিয়ে আসে, তাহলে আমি তার দিকে হস্তদ্বয় প্রসারিত পরিমাণ এগিয়ে আসি। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে তাহলে আমি তার দিকে দ্রুত হেঁটে আসি। (বুখারি ও মুসলিম)

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে উল্লেখিত সহজ জিকিরগুলো আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

সুরা কাহাফের প্রথম ১০ আয়াতের ফজিলতঃ

সুরা কাহাফের প্রথম ১০ আয়াতের ফজিলত
কিছু কিছু সুরা মুখস্থ করা আবশ্যক, যেমন সুরা ফাতিহা। এই সুরা ছাড়া নামাজ হয় না। আবার কিছু সুরা মুখস্ত করা আবশ্যক না হলেও সেগুলো শেখার ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে, যেমন আবার সুরা কাহাফ। সুরা কাহাফের ৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'তারা এই বাণীতে বিশ্বাস না করলে তাদের পেছনে পেছনে ঘুরে ঘুরে তুমি হয়তো দুঃখে নিজেকে শেষ করে ফেলবে।'

এ সুরার দশম আয়াতে একটি দোয়া আছে। এই দোয়া গুহাবাসী যুবকেরা করেছিল। 'হে আমাদের প্রতিপালক তুমি নিজ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করো ও আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্মকে সঠিক ভাবে পরিচালনা করার ব্যাবস্থা করো

কোরআন মুখস্থ করলে ইমান বৃদ্ধি হয়। সুরা আল কাহাফে কয়েকটি গল্প রয়েছে যেগুলি দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগের জন্য বাস্তব পাঠ শেখায় এবং কোরআনের সঙ্গে দৃঢ় সংযোগ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। যেমন, 'পৃথিবীর ওপর যা কিছু আছে আমি সেগুলোকে তার শোভা করেছি মানুষকে, এই করার জন্য যে ওদের মধ্যে কে কর্মে ভালো।' (সুরা কাহাফ, ৭)
রাসুল (সা.) আমাদের সুরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করতে বলেছেন। হাদিসে আছে, 'যে ব্যক্তি সুরা কাহাফের প্রথম ১০ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্তি পাবে।' (মুসলিম শরিফ)

সুরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াতে ইসলামের মৌলিক কয়েকটি বিষয়ে বলা হয়েছে। 'আর তাদের সতর্ক করার জন্য যারা বলে যে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন, এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। উদ্ভট কথাই তাদের মুখ থেকে বের হয়, তারা কেবল মিথ্যাই বলে।' (সুরা কাহাফ, ৪-৫)

রাসুলের (সা.)–এর ওপর ওহি অবতীর্ণ হওয়ার আলোচনা এসেছে, ‘প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি তাঁর দাসের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন ও এর মধ্যে তিনি কোনো অসংগতি রাখেননি।’ (সুরা কাহাফ, ১)

জুমার দিনে সুরা কাহাফ পাঠঃ

রাসুল (সা.) আমাদের সুরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করতে বলেছেন। হাদিসে আছে, ‘যে ব্যক্তি সুরা কাহাফের প্রথম ১০ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্তি পাবে।’ (মুসলিম শরিফ)
প্রতিদানের কথা এসেছে পরের আয়াতে। তাতে ভয় ও আশা দুটি আবেগই দেখা যায়। ‘তার কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন আর বিশ্বাসীগণ যারা সৎকাজ করে, তাদেরকে সুসংবাদ দেবার জন্য যে তাদের জন্য বড় ভালো পুরস্কার রয়েছে।’ ‘সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।’ (সুরা কাহাফ, ২-৩)

কোরআন মুখস্থ করলে ইমান বৃদ্ধি হয়। সুরা আল কাহাফে কয়েকটি গল্প রয়েছে যেগুলি দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগের জন্য বাস্তব পাঠ শেখায় এবং কোরআনের সঙ্গে দৃঢ় সংযোগ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। যেমন, ‘পৃথিবীর ওপর যা কিছু আছে আমি সেগুলোকে তার শোভা করেছি মানুষকে, এই করার জন্য যে ওদের মধ্যে কে কর্মে ভালো।’ (সুরা কাহাফ, ৭)

সুরা কাহাফে রয়েছে বক্তব্য ও উপদেশঃ

রাসুল (সা.) আমাদের আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন, ‘আদমের সৃষ্টির পর থেকে বিচার দিবসের আগ পর্যন্ত দাজ্জালের চেয়ে বড় আর কোনো ফিতনা নেই।’ (মুসলিম শরিফ) এটি দাজ্জালের বিরুদ্ধে একটি ঢাল।

সুরা কাহাফে চারটি ঘটনা, চারটি বক্তব্য ও উপদেশ রয়েছে। সুরার ১ থেকে ৮ আয়াতে রয়েছে বক্তব্য। ৯ থেকে ২৬ আয়াতে আছে আসহাবে কাহাফের ঘটনা।(সূরা কাহফ)

সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত ও তার ফজিলতঃ

সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত
পবিত্র কোরআনের দ্বিতীয় সুরা বাকারা। এ সুরার শেষ দুটি আয়াতের রয়েছে বিশেষ ফজিলত ও তাৎপর্য। রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসুল, কোরআনের কোন সুরা সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান? তিনি বললেন, সুরা ইখলাস। এরপর ব্যক্তিটি আবার প্রশ্ন করলেন, কোরআনের কোন আয়াতটি মর্যাদাবান? তিনি বললেন, আয়াতুল কুরসি।

এরপর লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী, আপনি কোন আয়াতটি পছন্দ করেন, যাতে আপনার উম্মত লাভবান হবে। নবীজি (সা.) বললেন, সুরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত।

সূরা কাহফ কখন অবতীর্ণ হলোঃ
সহিহ্ মুসলিম শরিফ এ দুটি আয়াতের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, 'এ দুটি আয়াত রাসুল (সা.)-কে মিরাজের রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সঙ্গে আসমানে দান করা হয়েছে।'

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যখন আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তিনটি জিনিস দান করা হয়: ১. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, ২. সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত, ৩. উম্মতদের মধ্যে যারা শিরক করে না, তাদের কবিরা গুনাহ মাফ হওয়ার সুসংবাদ।' (মুসলিম, তাফসিরে মাজহারি)

হে আল্লাহর নবী, আপনি কোন আয়াতটি পছন্দ করেন, যাতে আপনার উম্মত লাভবান হবে। নবীজি (সা.) বললেন, সুরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত।
আয়াত দুটো উচ্চারণ

আমানার রাসুলু বিমা উনঝিলা ইলাইহি মিররাব্বিহি ওয়াল মুমিনুন। কুল্লুন আমানা বিল্লাহি ওয়া মালা ইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি লা নুফাররিকু বাইনা

আহাদিমমির রুসুলিহি। ওয়া কালু সামিনা ওয়া আতানা গুফরানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসির। লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসআহা-লাহা মা কাসাবাত ওয়া আলাইহা মাকতাসাবাত-রাব্বানা লা তুআখিজনা ইন-নাসিনা আও আখতানা-রাব্বানা ওয়া লা তাহমিল আলাইনা ইসরান কামা হামালতাহু আলাল্লাজিনা মিং ক্বাবলিনা-রাব্বানা ওয়া লা তুহাম্মিলনা মা লা তাকাতা লানা বিহি-ওয়াফু আন্না ওয়াগফিরলানা ওয়ারহামনা- আংতা মাওলানা ফাংসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন।' (সুরা বাকারা: আয়াত ২৮৫-২৮৬)

এ দুটি আয়াতের অর্থ হলো, 'তার প্রতিপালকের কাছ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে রাসুল তার ওপর বিশ্বাস করে আর বিশ্বাসীরাও। তারা সকলেই বিশ্বাস করে আল্লাহয়, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবগুলোয় ও তাঁর রাসুলদের ওপর (এবং তারা বলে,) আমরা তাঁর রাসুলদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনি ও মানি। হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তোমার নিকট ক্ষমা চাই, আর তোমার কাছেই আমরা ফিরে যাব।' আল্লাহ্ কাউকেই তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বভার দেন না। ভালো ও মন্দ যে যা উপার্জন করবে তা তারই। (তোমরা প্রার্থনা করো,) হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই বা ভুল করি তবে তুমি আমাদেরকে অপরাধী কোরো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে যে ভারী দায়িত্ব দিয়েছিলে আমাদের ওপর তেমন দায়িত্ব দিয়ো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এমন ভার আমাদের ওপর দিয়ো না যা বইবার শক্তি আমাদের নেই। আর আমাদের পাপ মোচন করো, আর আমাদেরকে ক্ষমা করো, আর আমাদের ওপর দয়া করো, তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তুমি আমাদের জয়যুক্ত করো।' (সূত্র: কোরানশরিফ: সরল বঙ্গানুবাদ, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রথমা প্রকাশন, ২০২০)

সুরা বাকারার ২৮৫-২৮৬ আয়াত নিয়মিত পাঠ করলে জান্নাতের পথ সুগম করবে

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যখন আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তিনটি জিনিস দান করা হয়: ১. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, ২. সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত, ৩. উম্মতদের মধ্যে যারা শিরক করে না, তাদের কবিরা গুনাহ মাফ হওয়ার সুসংবাদ।' (মুসলিম, তাফসিরে মাজহারি)

সূরা বাকারার আরও ফজিলতঃ

সুরা বাকারার শেষ আয়াত দুটি নিয়ে হাদিসে আরও অনেক ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। এ দুটি আয়াতের ফজিলত প্রসঙ্গে নবী (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি রাতে এ দুটি আয়াত পাঠ করবে, তার জন্য এটাই যথেষ্ট।’

জুবাইর ইবনু নুফাইর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘সুরা আল-বাকারাকে আল্লাহ এমন দুটি আয়াত দিয়ে শেষ করেছেন, যা আমাকে আল্লাহর আরশের নিচের ভান্ডার থেকে দান করা হয়েছে। তাই তোমরা এ আয়াতগুলো শিখবে, স্ত্রীদেরও শেখাবে। কারণ এ আয়াতগুলো হচ্ছে রহমত, (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের উপায় ও (দীন দুনিয়ার সকল) কল্যাণ লাভের দোয়া।’ (মিশকাতুল মাসাবিহ: ২১৭৩)

সুরা বাকারার সার কথাঃ

আমানার রাসুলু বিমা উনঝিলা ইলাইহি মিররাব্বিহি ওয়াল মুমিনুন। কুল্লুন আমানা বিল্লাহি ওয়া মালা ইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিমমির রুসুলিহি। ওয়া কালু সামিনা ওয়া আতানা গুফরানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসির। লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসআহা-লাহা মা কাসাবাত ওয়া আলাইহা মাকতাসাবাত-রাব্বানা লা তুআখিজনা ইন-নাসিনা আও আখতানা-রাব্বানা ওয়া লা তাহমিল আলাইনা ইসরান কামা হামালতাহু আলাল্লাজিনা মিং ক্বাবলিনা-রাব্বানা ওয়া লা তুহাম্মিলনা মা লা তাকাতা লানা বিহি-ওয়াফু আন্না ওয়াগফিরলানা ওয়ারহামনা- আংতা মাওলানা ফাংসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন।’ (সুরা বাকারা: আয়াত ২৮৫-২৮৬)

সুরা বাকারার শেষ দুটি আয়াতে রয়েছে বিশেষ ফজিলত ও তাৎপর্য

আবু মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি রাতের বেলা আয়াত দুটি তিলাওয়াত করবে, তার জন্য এ আয়াত দুটোই যথেষ্ট। অর্থাৎ রাতে কোরআন মজিদ তিলাওয়াত করার যে হক রয়েছে, কমপক্ষে সুরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত তিলাওয়াত করলে তার জন্য তা যথেষ্ট।’ (বুখারি: ৪০০৮)

হজরত আলী (রা.) বলেছেন, ‘আমার মতে যার সামান্য বুদ্ধিজ্ঞান আছে, সে এ দুটি আয়াত পাঠ করা ছাড়া নিদ্রা যাবে না।’

এ আয়াত দুটো নিয়মিত পড়লে বিপদ-আপদ দূরে থাকে, জান্নাতের পথও সুগম হয়।

আল্লাহর জিকিরে দূর হয় মানসিক অশান্তিঃ

পাপে হৃদয় কলুষিত হয়, কলবে ধরে জং, নষ্ট করে মানসিক প্রশান্তি, বাড়ায় হতাশা, বিষণ্নতা ও হাজারও দুর্ভাবনা।

কেন এমন হয়? নবীজি ইরশাদ করেন, বান্দা যখন পাপ করে তখন তার অন্তরের মধ্যে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর সে আবার পাপ করলে তার অন্তরে আরো দাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এভাবে তার পুরো অন্তর কালো দাগে ঢেকে যায়। (তিরমিজি: ৩৩৩৪)

কলব থেকে পাপের কালিমা দূর করার অন্যতম মাধ্যম হলো জিকির। জিকির মানুষের কলবকে করে পরিষ্কার এবং তাজা। দূর করে মানসিক বিষন্নতা ও পেরেশানি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, জেনে রাখ, জিকিরের মাধ্যমে মন শীতল এবং প্রশান্ত হয়। (সূরা রা’দ: ২৮)

প্রতাপশালী এবং ওপর মহলের একটু সুদৃষ্টি পাওয়ার জন্য মানুষ হরেক রকম চেষ্টা তদবির করে। অথচ তেমন কোন কষ্ট ছাড়াই জিকিরের মাধ্যমে মহাপ্রতাপশালী এবং সর্বশক্তিমানের নৈকট্য অর্জন করা যায়।

নবীজি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, বান্দা যখন আমার জিকির করে তখন আমি তার সাথে থাকি। বান্দা যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে আমিও তাকে অন্তরে স্মরণ করি। বান্দা কোনো মজলিসে আমার কথা আলোচনা করলে আমি তার চেয়ে উত্তম মজলিসে তার আলোচনা করি। (সহীহ মুসলিম: ২৬৭৫)

এছাড়া কুরআনে পাকে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদের স্মরণ করব। (সূরা বাকারা: ১৫২)

কেয়ামতের ভয়াবহতার কথা কমবেশি সবাই জানে। কঠিন সেই দিনে আরশের ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবেন। সেই বিপদক্ষনে যিকিরকারী ব্যক্তিরা আরশের শীতল ছায়াতলে ঠাঁই পাবে। নবীজি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন। তাদের একজন হলো, যে নিরিবিলি আল্লাহর জিকির করেছে এবং চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়েছে। (সহীহ বুখারী: ৬৪৭৯)

নবীজিকে একজন সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলামের বিধান তো অনেক। আমাকে এমন একটি বিষয় বলে দিন যার উপর আমি সর্বদা আমল করতে পারি। নবীজি বললেন, তোমার জিহবাকে আল্লাহর জিকিরে তরতাজা রাখ। (জামে তিরমিযী:৩৩৭৫)

অপর এক হাদিসে নবীজি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, বান্দা যতক্ষণ আমাকে স্মরণ করতে থাকে এবং আমার যিকিরের কারণে তার ঠোঁট নড়তে থাকে, ততক্ষণ আমি তার সাথে থাকি। অর্থাৎ আল্লাহর রহমত তার সাথে থাকে। (ইবনে মাজাহ- ৩৭৯২)

জিকিরের মজলিস অন্যসব মজলিস থেকে শ্রেষ্ঠ। ইবাদতের মজলিস আল্লাহর রহমত চাদরে আবৃত থাকে। নবীজির ইরশাদ করেন, যখন মানুষ আল্লাহর জিকির করে তখন ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখেন, আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয় এবং তাদের উপর সাকিনা নাযিল হয়, আর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের সামনে তাদের কথা আলোচনা করেন। (সহীহ মুসলিম: ৭০০)

সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির লা ইলাহা ইল্লাল্লাহঃ

মহান আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণায় ' লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ' যিকির সর্বোত্তম। এই যিকিরকে যিকিরে তাওহীদও বলা হয়।

আল্লাহপাকের জিকির ও স্মরণের অসংখ্য পথ ও পদ্ধতি রয়েছে। এর যে কোনো একটি অবলম্বন করলেই জিকির সম্পন্ন হয়ে যায়। তবে, সবচেয়ে উত্তম জিকির হলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াদাহু লা শারীকা লাহু'।

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য মা'বুদ বা উপাস্য নেই, তিনি একক তার কোনো অংশী নেই। এই জিকিরের মধ্যে তাওহীদের স্বীকৃতি যেমন মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে, তেমনি অংশীবাদিতার যাবতীয় উপায় উপকরণকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। নবী করিম সা. স্পষ্টতই বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম দোয়া হলো আরাফাত দিবসের দোয়া। আর সবচেয়ে উত্তম কথা হলো যা আমি এবং অতীতের নবীগণ বলেছেন। আর তা হলো: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আ'লা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর।' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য মা'বুদ বা উপাস্য নেই। তিনি একক অদ্বিতীয়। তার কোনো শরীক নেই। সকর রাজত্ব কেবলমাত্র তারই জন্য। আর প্রশংসাও একমাত্র তারই। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

মহান রাব্বুল আলামীন স্বীয় ঈমানদার বান্দাহগণকে অধিক হারে তার জিকির করার এবং সকাল সন্ধ্যায় তার তাসবীহ বা প্রশংসা করার তাকীদ করেছেন। আল কোরআনে ইরশাদ হয়েছে : ওহে যারা ঈমান এনেছ; তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি করে জিকির (স্মরণ) কর। আর সকাল-সন্ধ্যা তার তাসবীহ (প্রশংসা) কর। (সূরা আহযাব : ৪১-৪২)।

এ ছাড়া আল্লাহপাকের জিকিরের জন্য তিনি নামাজ কায়েম করার ব্যবস্থাও করেছেন। আল কোরআনে ইরশাদ হয়েছে : তোমরা আমার জিকিরের জন্য নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর। (সূরা ত্বাহা : ১৫৪)।

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, ঈদুল আযহার পরবর্তী তিনদিনে আইয়্যামে তাশরীক বলা হয়। এই দিনগুলোকে আল্লাহপাক ঈমানদার বান্দাহদের জন্য পানাহার করা ও জিকির করার জন্য নির্ধারণ করেছেন। নবী করিম সা. বলেছেন : তাশরীকের দিনগুলো হচ্ছে পানাহার এবং আল্লাহর জিকিরের জন্য।

মোট কথা, আল্লাহপাক আমাদেরকে তার জিকির করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি জিকিরকারী বান্দাহদের প্রশংসা করেছেন এবং তাদের জন্য পুরস্কারের অঙ্গীকার করেছেন। বিভিন্ন ইবাদত আদায় করার পর মুমিন বান্দাহগণকে তিনি জিকির করার আদেশ করেছেন। আল কোরআনে ইরশাদ হয়েছে : তোমরা যখন নামাজ কায়েম করা সম্পন্ন করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহর জিকির করবে। (সূরা আন নিসা : ১০৩)।

বিশেষত হজ পালনের সময় আল্লাহর জিকির করার তাকিদ করা হয়েছে। আল কোরআনে ইরশাদ হয়েছে : যখন আরাফাত থেকে তোমরা ফিরে আসবে তখন (মুজদালিফায়) মাসায়ারে হারামের নিকট আল্লাহর জিকির করবে। (সূরা বাকারাহ : ১৯৮)।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা আরও ঘোষণা করেছেন : আর তারা (মুমিনগণ যেন নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহপাক তাদেরকে চতুস্পদ জন্তুর মধ্য থেকে যে সকল রিজিক প্রদান করেছেন, এর জন্য আল্লাহর নাম স্মরণ করে। (সূরা বাকারাহ : ২০৩)।

এখানে এ কথা স্পষ্টতই বলা যায় যে, মানবজীবনে ঈমানদার বান্দাহগণের উচিত সকল সময়ে আল্লাহপাকের জিকিরে নিমগ্ন থাকা। কেননা, যারা আল্লাহর জিকিরের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাদের দুনিয়ার জীবন হয় অভাব-অনটনে পরিপূর্ণ এবং পরকালে হাসরের ময়দানে তারা অন্ধ হয়ে উত্থিত হবে। এমনটা কারও কাম্য হতে পারে না।

হুযুর পাক (সাঃ) এরশাদ করেন-" সর্বোত্তম যিকির হলো- লা - 'ইলাহা ইল্লাল্লাহু', আর সর্বোত্তম দোয়া হলো- 'আলহামদুলিল্লাহ '।-(মিশকাত, তিরমিযী,ইবনে মাজাহ)

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন -"একবার হযরত মূসা আঃ আল্লাহ তাআলার পাক দরবারে আরজ করিলেন, হে আল্লাহ আমাকে এমন কোন অজিফা শিখাইয়া দিন যাহা দ্বারা আমি আপনাকে স্মরণ করিব এবং আপনাকে ডাকিবো, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিলেন -'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়িতে থাকো, তিনি আরজ করিলেন, হে পরওয়ার দিগার ইয়া তো সকলেই পড়িয়া থাকে।
আল্লাহ তা'আলা পুনরাই বলিলেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়িতে থাকো হযরত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরজ করিলেন, হে আমার রব আমি তো এমন একটি বিশেষ জিনিস চাইতেছি যাহা একমাত্র আমাকেই দান করা হয়,
এরশাদ হইল হে মুসা! সাত তবক আসমান এবং সাত তবক জমিনকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর অপারপাল্লায় ' লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ' রাখা হয় তবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাল্লাই ঝুকিয়া যাইবে। (তারগীব,নাসাঈ, ইবনে হিব্বান হাকিম)

আল্লাহ তাআলার নিয়ম এই যে, যে জিনিস যত বেশি প্রয়োজনীয় উহাকে তত বেশি ব্যাপকভাবে দান করিয়া থাকেন। দুনিয়াবী প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই দেখা যায় শ্বাস-প্রশ্বাস, পানি বাতাস কত ব্যাপক প্রয়োজনীয় জিনিস, কাজেই আল্লাহ তায়ালা এইগুলিকে কত ব্যাপক করিয়া রাখিয়েছেন। তবে ইয়াও জানিয়ে রাখা জরুরী যে, আল্লাহ তাআলার দরবারে ওজন হইল 'ইখলাসের'। যেই পরিমাণ ইখলাসের সাথে কোন কাজ করা হইবে ততই ওজনই হইবে, আর ইখলাসের অভাবে যেই পরিমাণ হইবে ততই হালকা হইবে। ইখলাস পয়দা করার জন্যই এই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যিকির বেশি বেশি করা।

অন্য হাদিসে বলা হইয়াছে, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, কিয়ামতের দিন আপনার শাফায়াত দ্বারা কোন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি উপকৃত হইবে হুজুর সাঃ জবাবে এরশাদ করিলেন -"আমার সাফাত দ্বারা সবচেয়ে বেশি উপকৃত ও সৌভাগ্যবান ওই ব্যক্তি হইবে যে অন্তরের একলাসের সহিত' লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলিবে। "-(বুখারী)

এই হাদিস দ্বারা ওই সকল লোককে বুঝানো হইয়াছে, যাহারা এ ইখলাসের সহিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করিবে এবং করিতে থাকিবে এবং তাহাদের নেক আমলও

রহিয়াছে। তাহাদের সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান হওয়ার অর্থ এই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাফায়াত দ্বারা তাহারা বেশি উপকৃত হইবে কেননা উহা তাহাদের মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হইবে।

হারাম কাজ ও কবিরা গুনাহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখিয়া এই পাক কালিমার যিকির করা।আমাদের সমাজে অনেক এমমন লোক আছে, যাহারা, হাতে তাসবিহ নিয়া যিকির করে আবার সুযোগ পেলে গোনাহ (গীবত,পরনিন্দা, হিংসা) করে। আসলে তারা ঐ যিকির করে লোক দেখানোর জন্য। নিজেকে পবিত্র করার জন্য নয়।

যিকিরের মুল উদ্দেশ্য হবে নিজেকে গোনাহমুক্ত করে আল্লাহর সান্নিধ্যে উপনীত হওয়া।যেমন হাদিসে এসেছে - "কোন বান্দা এমন নাই যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে আর তাহার জন্য আসমান সমূহের দরজা খুলিয়া যায় না, এমনকি এই কলেমা সোজা আরশ পর্যন্ত পৌছিয়া যাই তবে শর্ত এই যে ইহার পাঠকারি কবিরা গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে। "

জামাতবদ্ধভাবে কালিমার শিক্ষা দেওয়াঃ

বিভিন্ন মজলিসে জামাতবদ্ধ হয়ে এই কালিমার যিকির করার মধ্যেও ঈমানী শক্তি বাড়িয়া যাইবে।কারণ, একা একা ইবাদত থেকে জামাতবদ্ধ ইবাদতের মর্যাদা বেশি বলা হয়েছে। কারণ,এই সময় কোন লৌকিকতা অন্তরে আসে, সবাই যিকিরে রত থাকে।যেমন মসজিদে যখন সবাই একইসাথে নামাজে দাড়ায় তখন কারর মনে লোকদেখানো নামাজের প্রশ্নই আসে না, সবাই নামাজে রত, এখানে শয়তান নামাজ ধ্বংস করার কেন সুযোগ পায় না, সে হয়রান হয়ে যায়।এ জন্যই পুরুষদের মসজিদে জামাতে নামাজ পড়ার হুকুম করা হয়েছে। যাতে এই ট্রেনিং বা নির্দেশ পালনের মাধ্যমে অন্তর থেকে লৌকিকতা দূর হয়ে যায়।এরপর যখন সে অন্যান্য নামাজ বা নফল নামাজ পড়ে তখন লৌকিকতা আসে না।ঠিক তেমনিও যিকিরের ক্ষেত্রে মজলিসে একত্রিত হয়ে, জামাতবদ্ধ হয়ে যিকির করলে আর লৌকিকতা থাকে না অন্তরে, যার কারণে সে যিকিরে প্রকৃত মজা পায়, মহান আল্লাহর নিকটবর্তী হয়,

আল্লাহকে ভয় পায়, সকল প্রকার গেনাহ থেকে বেচে থাকার চেষ্টা করে।এবং সাথে সাথে অন্যন্য ইবাদত বা যে কোন কাজ মহান আল্লাহর খুশির জন্যই করে। যা কিছু ত্যাগ করে আল্লাহর জন্যই করে।

সর্বোপরি, সে যখন একা একা যিকির করে তখনও তার অন্তরে কোন প্রকার লৌকিকতা আসে না। এখানেও শয়তান পরাস্ত হয়। কারণ, সদাসর্বদা যে জিকিরে রত থাকে শয়তান তার ক্বলবে প্রবেশ করার ক্ষমতা রাখেনা। এটাই সাফল্য।।

জামাতবদ্ধ যিকির করা সম্পর্কে হাদিসে এসেছেঃ-

হযরত সাদ্দাত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন এবং হযরত ওবাইদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এই ঘটনার সমর্থন করেন যে, একবার আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মজলিসে কোন অপরিচিত(অমুসলিম) লোক নাই তো? আমরা বলিলাম কেহ নাই। তখন তিনি বলিলেন, দরজা বন্ধ করিয়া দাও। অতঃপর বলিলেন, তোমরা হাত উঠাও এবং বলিতে থাকো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আমরা কিছুক্ষণ হাত উঠাইয়া রাখলাম এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়িলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন,' আলহামদুলিল্লাহ' হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এই কলেমা দিয়া পাঠাইছো এবং এই কলেমার ওপর জান্নাতের ওয়াদা করিয়াছ। আর তুমি কখনো ওয়াদা খেলাফ করো না। ইহার পর হুজুর সাল্লালাহু আলাই হি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলিলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে মাফ করিয়া দিয়েছেন।(তারগিব, আহমাদ, তাবারানী)

অন্য আরেক হাদিসে আছে, হুযুর পাক (সা:) নিজ ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় আয়াত (واصبر نفس......) নাযিল হইল।যার অর্থ হইল,হে নবী! আপনি নিজকে ঐ সকল লোকের নিকট বসিবার পাবন্দ করুন,যাহারা সকাল সন্ধ্যা আপন পরোয়ারদেগারকে ডাকে। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর হুযুর (সা:) ঐ সমস্ত লোকদের তলাশে বাহির হইলেন এবং একদল লোক দেখিলেন, তাহারা আল্লাহর জিকিরে মশগুল ছিল। তাহাদের মধ্যে কিছুলোক এমন রহিয়াছে, যাহাদের চুল

এলোমেলো,শরীরের চামড়া শুকনা, একটি মাত্র কাপড় পরনে। যখন হুযুর(সা:) তাহাদের দেখেলপন তখন তাহাদের সহিত বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক পয়দা করিয়াছেন যে, স্বয়ং আমাকে তাহাদের সহিত বসুবার হুকুম করিয়াছেন। (দূররে মানসূরঃ তারাবানী)

এক হাদীসে আছে, হযরত সালমান ফারসী (রাযি:) এবং আরোও অন্যান্য সাহাবীদের এক জামাত আল্লাহর জিকিরে মশগুল ছিলেন।হুযুর (সা:) সেখানে তশরীফ আনিলে সকলেই চুপ হইয়া গেলেন।হুযুর (সা:) বলিলেন, তোমরা কি করিতেছিলে? তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমরা আল্লাহর জিকিরে মশগুল ছিলাম।হুযুর (সা:) বলিলেন, আমি দেখিতে পাইলাম তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত নাজিল হইতেছে। তখন আমারও দীল চাহিল তোমাদের সাথে শরীক হই। অতঃপর এরশাদ করিলেন, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তা'য়ালা আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক পয়দা করিয়াছেন, যাহাদের নিকট বসিবার জন্য আমাকে হুকুম করা হইয়াছে। হযরত ইবরাহীম নখয়ী (রহ:) বলেন,'আল্লাহকে ডাকে' বলিয়া কোরআনে যাহাদের কথা বলা হইয়াছে তাহারা 'যিকিরকারীদের জামাত'। এই ধরনের আয়াত হইতেই সুফিয়ায়ে কেরামগন বলেন যে, পীর মাশায়েখগনকেও মুরিদাদের নিকট বসা উচিৎ।

কেননা ইহাতে মুরিদানকে ফাইদা পৌছাবে, তাছাড়াও সব ধরনের লোকের সহিত মেলামেশার কারণে শায়খের নফসের জন্যও পূর্ণ মুজাহাদা হইবে। নানা প্রকার বদ আখলাক লোকদের অশোভনীয় আচরণ সহ্য করার ফলে শায়খের নফসের মধ্যে আনুগত্য ও বিনয়ভাব পয়দা হইবে।

ইহা ছাড়াও অনেক গুলি দিলের একত্রিত হওয়া আল্লাহর রহমতকে আকর্ষণ করার ব্যাপারে বিশেষ ভুমিকা রাখে। এই কারনেই শরীয়তে জামাতের সহজ ত নামাজ পড়ার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। ইহাই বড় কারণ যে, আরাফার ময়দানে সমস্ত হাজী সাহেবানদের একই অবস্থায় একই ময়দানে আল্লাহর দিকে মনোযোগী করা হয়।

'জামেউল উলুম' কিতাবে আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জামাতবদ্ধভাবে বা একা একা জিকিরের তালিম দিয়াছেন। জামাতবদ্ধ ভাবে

তালিম দেওয়ার বিষয়টি এই হাদিস দ্বারাই প্রমাণিত। এ মতাবস্থায় দরজা বন্ধ করার দ্বারা শিক্ষার্থীদের তাওয়াজ্জুহ ও মনোযোগ পূর্ণ করা উদ্দেশ্য। এই কারণেই অপরিচিত লোক মজলিসে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কেননা অপরিচিত ব্যক্তির মজলিসে উপস্থিতি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোযোগ নষ্ট হওয়ার কারণ না হইলেও শিক্ষার্থীদের মনোযোগ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তো ছিলই।

কালিমা একবার পড়ে মুসলমানের খাতায় নাম দিয়ে যে আর পড়া লাগে না এটা নয়, বরং বারবার পড়ার মাধ্যমে ঈমানকে তাজা করা।

যেমন এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন,তোমরা নিজেদের ঈমানকে নতুন করিতে থাকো,অর্থাৎ তাজা করিতে থাক। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমানকে কিভাবে নতুন করিব? এরশাদ ফরমাইলেন, লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু বেশি বেশি পড়িতে থাক। (তারগীবঃ আহমদ,তাবারানী)

এখানে ঈমানকে নতুন করার অর্থ হইলো গেনাহের কারণে ঈমানী শক্তি এবং ঈমানী নূর কমিয়া যায় বা পুরাতন হইয়া যায়।যার কারণে গোনাহকে গোনাহ মনে হয় না।অন্য এক হাদিসে এসেছে বান্দা যখন গুনাহ করে তাহার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়িয়া যায় যদি সে খাঁটি ভাবে তওবা করে তবে সেই দাগ মিটিয়া যায় নতুবা জমিয়ে থাকে অতঃপর যখন আরো একটি গুনাহ করে তখন আরো একটি দাগ পড়িয়া যায় এইভাবে অন্তর সম্পূর্ণ কালো ও মরিচা যুক্ত হইয়া যায় তখন গুনাহকে গুনাহ মনে হয় না তখন দিল পুরাতন হইয়া যাই ঈমান পুরাতন হইয়া যায়।এ সম্পর্কে পবিত্র বলা হয়েছে যে-

"كلا بل - ران على قلوبهم ما كانوا يمسبون"
অর্থ, ইহার পর অন্তরের অবস্থা এমন হইয়া যায় যে, সত্য কথা উহাতে আর কোন আছর করে না বরণ প্রবেশেই করে না। "

এই অবস্থায় বেশি বেশি লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়িলে অন্তর আবার জিবিত হইয়া উঠে, ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায়। ঈমান আবার নতুন হইয়া যায়।এহেন অবস্থায় সে এমন এক

ধরনের প্রশান্তি পায় যে, আল্লাহর সব হুকুম আহকাম পালন করতে মজা পায়। নামাজ,রোজা,হজ্জ, যাকাত, জিহাদ, সাংসারিক কাজকর্ম ও রিজিক সংক্রান্ত কাজকর্মও মহান আল্লাহর হুকুমের প্রতি খেয়াল করেই করে। মনে অপরিসীম প্রশান্তি বিরাজ করে।

তাই মনে এমন প্রশান্তি ধরে রাখার জন্য সকাল সন্ধ্যা কিছু সময় যিকিরে মগ্ন হওয়া অথবা মুজাহাদার মাধ্যমে সারাদিন সমস্ত কাজকর্মের সাথে অন্তরকে আল্লাহর যিকিরে নিবদ্ধ রাখা।

ক্বলব বা অন্তর বা শ্বাস- প্রশ্বাসের যিকিরঃ

ক্বলব বা অন্তর বা শ্বাস -প্রশ্বাসের যিকির ২ টি। যেটা সদাসর্বদা করা যায়। (১) আল্লাহ আল্লাহ (২) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু

এছাড়া বাকিগুলো তাসবিহাতের যিকির ও দোয়া।

তাই ক্বলব পবিত্রের জন্য এবং আল্লাহর অধিক নিকটবর্তীর জন্য উল্লেখিত দুটি যিকির সদাসর্বদা করা প্রয়োজন।

এক হাদিসে এসেছে - রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন-" হাশরের মাঠে আল্লাহর কিছু বান্দা উপস্থিত হবেন যারা নবিও নয় আবার শহীদও নয় অথচ তাদের একটা বিশেষ মর্যাদা হবে। তখন উপস্থিত সাহাবাগন জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ! তাহারা কারা? তখন তিনি বললেন, তারা আল্লাহর এমন কিছু বান্দা, যারা দুনিয়াতে স্ত্রী, পুত্র, সন্তান, ধন-সম্পদ ও আত্মীয় স্বজনের মোহাব্বতের উর্ধ্বে মহান প্রভুকে এমনিভাবে ভালবাসে যে, তাদের শ্বাস- প্রশ্বাসে সর্বক্ষণ মহান প্রভুর স্মরণ চলে এবং তারা হাশরের মাঠে মহা নূরানী আলোকে উদ্ভাসিত হবে। "-(মেশকাত শরীফ)

উল্লেখিত হাদিস বলার পরে রসুলল্লাহ (সা:) সূরা ইউনুসের ৬২ নং আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন-

الا ان اولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون.

" জেনে রেখো! আল্লাহর বন্ধুদের কেন ভয় নেই, আর তারা দুঃখিতও হবে না।"

উল্লেখিত হাদিস থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, ক্বলবানি বা শ্বাশ- প্রশ্বাসের জিকির সর্বদা কাজকর্মের মধ্যে চালু রাখতে পারলে আমাদের অন্তর থেকে দুনিয়ার মোহাব্বত দূর হয়ে মহান আল্লাহর প্রতি মোহাব্বত পয়দা হবে। যার কারণে ধন-সম্পদ আত্মীয় স্বজন সব কিছু থেকে বেশি আল্লাহর প্রতি মোহাব্বত হবে এবং প্রতিটি কাজেকর্মে মহান আল্লাহর হুকুমত জারি করার চেষ্টা করবে ইনশাআল্লাহ।

জিকিরই কলবকে সজীব রাখার পথঃ

হজরত আবু দারদা (রা.) বলেন, 'যাদের জিহ্বা আল্লাহর জিকিরে তরতাজা থাকবে, তারা হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'প্রতিটি জিনিসের মরিচা পরিষ্কার করার যন্ত্র আছে, আর অন্তরের মরিচা পরিষ্কার করার যন্ত্র হলো আল্লাহর জিকির।' (বায়হাকি)

অবসর ও আরামের সময় জিকির করতে থাকলে বিপদে-আপদে তা কাজে আসে। দিনে-রাতে, সুস্থতা-অসুস্থতায়, হাঁটাচলায়, কাজের ফাঁকে সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকির অন্তরে রাখা প্রয়োজন। জিকির অন্তরে শান্তি ও প্রশস্ততা এনে দেয়।

হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, 'যে ব্যক্তি নীরবে বসে আল্লাহর জিকির করে ও তার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে, আল্লাহ তাকে তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন।' (বুখারি ও মুসলিম)

কোরআনে আছে, ‘তারপর যখন তোমরা নামাজ শেষ করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে বা শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে। যখন তোমরা নিশ্চিন্ত হবে, তখন নামাজ কায়েম করবে। নির্ধারিত সময়ে নামাজ কায়েম করা বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্যকর্তব্য।’ (সুরা নিসা: ১০৩)

সব ইবাদতই আল্লাহর জিকির ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহর স্মরণ বা জিকির বিষণ্নতা দূর করে, মানসিক উত্তেজনা কমায়, হতাশা দূর করে ও দুশ্চিন্তামুক্ত রাখে।

কালেমায়ে তাইয়েবা ইসলামের মূল ভিত্তি। আর আল্লাহর জিকির বা স্মরণই সব ইবাদতের প্রাণ। নামাজেরও একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহকে স্মরণ

চিন্তা ফিকিরের যিকিরঃ

মহান আল্লাহকে নিয়ে চিন্তা করা এবং তার সৃষ্টি রহস্য নিয়ে গবেষণা করাও এক ধরনের উত্তম যিকির। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) লিখিয়াছেন, চিন্তা ফিকিরকে উত্তম ইবাদত এজন্যই বলা হইয়াছে যে, চিন্তা- ফিকিরের মধ্যে যিকিরের দিকটা তো আছেই অতিরিক্ত আরোও দুটি জিনিস রহিয়াছে। একটি হলো, আল্লাহর মারফত। কেননা, মারেফাতের চাবিকাঠিই হইলো চিন্তা ফিকির। আর আরেকটি হলো আল্লাহর মোহাব্বত। যাহা ফিকিরের দ্বারাই হাসিল হয়। এই চিন্তা ফিকিরকে জ্ঞানী বুজুর্গব্যাক্তিগন 'মোরাকাবা' বলেন।

মারেফাত: বুজুর্গ ব্যাক্তিগন অবিরত রিয়াজত এবং অক্লান্ত পরিশ্রম সহ ইবাদাতে রত থাকেন এবং নিরবচ্ছিন্ন যিকির ফিকির দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অপরাপর যাবতীয় পদার্থকে ভুলে যান।এমনভাবে তন্ময় হয়ে পড়েন যে, আল্লাহ ভিন্ন অপরাপর যাবতীয় পদার্থকে ভুলে যান।পরিশেষে তাদের অন্তরে এমন এক অপূর্ব অবস্থার সৃষ্টি হয় যে,তখন আল্লাহর মহিমা-মাহাত্ম্য ও ক্ষমতা- প্রতাপ প্রভৃতি গুনাবলি তাদের সন্মুখে প্রত্যক্ষ দর্শনের ন্যায় উজ্জ্বল ও স্পষ্টরুপে প্রতীয়মান হতে আরম্ভ করে।তখন তারা মহান আল্লাহর হুকুমে ভীত- সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। তাই প্রতিটি ইবাদতের ক্ষেত্রে তাদের মহিমা ফুটে ওঠে। চরম সত্য প্রকাশ পেতে থাকে।

এজন্যই প্রিয় নবী (সাঃ) মহান আল্লাহর সান্নিধ্য যখন অনুভব করলেন তখন তিনি হেরা গুহায় নিরবচ্ছিন্ন ইবাদত ও স্মরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন এবং তিনি হেরা গুহায় নিরবচ্ছিন্ন ইবাদতে রত হয়ে গেলেন।যার কারণে তার অন্তরে এমন এক অপূর্ব অবস্থার সৃষ্টি হয় যে,তখন আল্লাহর মহিমা মহাত্ম্য ও ক্ষমতা - প্রতাপ প্রভৃতি গুনাবলি তার সম্মুখে প্রত্যক্ষ দর্শনের ন্যায় উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হয়ে উঠে। চরম সত্য প্রকাশ হতে থাকে, তিনি যে আল্লাহর প্রিয় নবী, তিনি যে শেষ নবী হিসাবে পৃথিবীতে আগমন করেছেন তা তার সামনে স্পষ্ট হতে থাকে।

এজন্যই রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন -" আমার মারেফাত সবচেয়ে বেশি, তাই আমি আল্লাহকে বেশি ভয় পায় "- (সহিহ বুখারী)

মারফতের দ্বার একবার উন্মোচন হয়ে গেলে তার আর নিরবচ্ছিন্ন ইবাদতের প্রয়োজন হয় না। তখন তার নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত,জিহাদ, চাল- চলন, আচার- আচরন, প্রতিটি কাজ কর্মই ইবাদত হয়ে যায়।কারণ,সব কিছুর সাথে অন্তরের মধ্যে আল্লাহর যিকির- ফিকির চলে এবং প্রতিনিয়ত সে আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে এবং আল্লাহকে সে এহসানের সাথে সর্বদা নিজের সাথে প্রত্যক্ষ করে।

পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে -

ان في خلق السموات ولارض واختلاف اليل والنهار لايتت لاولى الا لباب.
الذين يذكرون الله فيا ما وقعودا وعلي جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموت ولارض، ربنا ما خلقت هاذا باطلا، سبحنك فقنا عذاب النار.

অর্থ, " নিশ্চয়ই আসমানসমুহ ও জমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত্র ও দিনের আবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে। যারা আল্লাহকে দাড়াইয়া,বসিয়া ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহর জিকির করে এবং আসমান ও জমিনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা ও গবেষণা করে এবং বলে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি অযথায়, অনর্থক এগুলো সৃষ্টি করনায় এবং তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি,আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।"

লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকিরের বিশেষত্বঃ

আল্লাহপাকের জিকির ও স্মরণের অসংখ্য পথ ও পদ্ধতি রয়েছে। এর যে কোনো একটি অবলম্বন করলেই জিকির সম্পন্ন হয়ে যায়। তবে, সবচেয়ে উত্তম জিকির হলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াদাহু লা শারীকা লাহু'।

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য মা'বুদ বা উপাস্য নেই, তিনি একক তার কোনো অংশী নেই। এই জিকিরের মধ্যে তাওহীদের স্বীকৃতি যেমন মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে, তেমনি অংশীবাদিতার যাবতীয় উপায় উপকরণকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। নবী করিম সা. স্পষ্টতই বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম দোয়া হলো আরাফাত দিবসের দোয়া। আর সবচেয়ে উত্তম কথা হলো যা আমি এবং অতীতের নবীগণ বলেছেন। আর তা হলো: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আ'লা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর।' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য মা'বুদ বা উপাস্য নেই। তিনি একক অদ্বিতীয়। তার কোনো শরীক নেই। সকর রাজত্ব কেবলমাত্র তারই জন্য। আর প্রশংসাও একমাত্র তারই। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

মহান রাব্বুল আলামীন স্বীয় ঈমানদার বান্দাহগণকে অধিক হারে তার জিকির করার এবং সকাল সন্ধ্যায় তার তাসবীহ বা প্রশংসা করার তাকীদ করেছেন। আল কোরআনে ইরশাদ হয়েছে : ওহে যারা ঈমান এনেছ; তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি করে জিকির (স্মরণ) কর। আর সকাল-সন্ধ্যা তার তাসবীহ (প্রশংসা) কর। (সূরা আহযাব : ৪১-৪২)।

এ ছাড়া আল্লাহপাকের জিকিরের জন্য তিনি নামাজ কায়েম করার ব্যবস্থাও করেছেন। আল কোরআনে ইরশাদ হয়েছে : তোমরা আমার জিকিরের জন্য নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর। (সূরা ত্বাহা : ১৫৪)।

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, ঈদুল আযহার পরবর্তী তিনদিনে আইয়্যামে তাশরীক বলা হয়। এই দিনগুলোকে আল্লাহপাক ঈমানদার বান্দাহদের জন্য পানাহার করা ও জিকির করার

জন্য নির্ধারণ করেছেন। নবী করিম সা. বলেছেন : তাশরীকের দিনগুলো হচ্ছে পানাহার এবং আল্লাহর জিকিরের জন্য।

মোট কথা, আল্লাহপাক আমাদেরকে তার জিকির করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি জিকিরকারী বান্দাহদের প্রশংসা করেছেন এবং তাদের জন্য পুরস্কারের অঙ্গীকার করেছেন। বিভিন্ন ইবাদত আদায় করার পর মুমিন বান্দাহগণকে তিনি জিকির করার আদেশ করেছেন। আল কোরআনে ইরশাদ হয়েছে : তোমরা যখন নামাজ কায়েম করা সম্পন্ন করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহর জিকির করবে। (সূরা আন নিসা : ১০৩)।

বিশেষত হজ পালনের সময় আল্লাহর জিকির করার তাকিদ করা হয়েছে। আল কোরআনে ইরশাদ হয়েছে : যখন আরাফাত থেকে তোমরা ফিরে আসবে তখন (মুজদালিফায়) মাসায়ারে হারামের নিকট আল্লাহর জিকির করবে। (সূরা বাকারাহ : ১৯৮)।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা আরও ঘোষণা করেছেন : আর তারা (মুমিনগণ যেন নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহপাক তাদেরকে চতুস্পদ জন্তুর মধ্য থেকে যে সকল রিজিক প্রদান করেছেন, এর জন্য আল্লাহর নাম স্মরণ করে। (সূরা বাকারাহ : ২০৩)।

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্টতই বলা যায় যে, মানবজীবনে ঈমানদার বান্দাহগণের উচিত সকল সময়ে আল্লাহপাকের জিকিরে নিমগ্ন থাকা। কেননা, যারা আল্লাহর জিকিরের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাদের দুনিয়ার জীবন হয় অভাব-অনটনে পরিপূর্ণ এবং পরকালে হাসরের ময়দানে তারা অন্ধ হয়ে উত্থিত হবে। এমনটা কারও কাম্য হতে পারে না।

কোরআন ও হাদিসের আলোকে শুধু 'আল্লাহ' শব্দের যিকির করার দলীল ।

আল্লাহর নাম 'আল্লাহ' শব্দের যিকিরের গুরুত্বঃ

رب المشرق (৮) واذكر اسم ربك و تبتل إليه تبتيلا (৭) إن لك فى النهار سبحا طويلا (১) واصبر على مايقولون واهجرهم هجرا جميلا (৯) والمغرب لاإله إلا هو فاتخذه وكيلا (১০ سورة المزمل آيت)

অর্থ : হে নবী! নিশ্চয় দিনের বেলায় আপনাকে অনেক চলাফেরা করে গাশ্ত করতে হয়। তাই আপনি নিতান্ত একাকী হয়ে আপনার রবের নাম "আল্লাহ" শব্দের যিকির করুন। (সূরা মুঝ্‌ঝাম্মিল, আয়াত ৮)

أي استعد على دعوتك بذكرالله ليلا و نهارا وانقطع إليه إنقطاعا تاما)صفوة التفاسير ج ১৯ ص ৫৭)

অর্থ : হে নবী! ঈমান ও ইসলাম ধর্মের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের শক্তি পাওয়ার জন্য এবং দাওয়াতের কাজকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আপনি দিন-রাত আল্লাহর নাম 'আল্লাহ' শব্দের যিকির করুন এবং 'আল্লাহ' শব্দের যিকির করার সময় পরিপূর্ণভাবে একাকী হয়ে ইজতেমায়ী অমল ছেড়ে দিয়ে এই ইনফিরাদী আমলে একান্তভাবে মনোনিবেশ করুন। (সফওয়াতুত তাফাসীর ১৯ খ. ৫৭ পৃ.)

،هذه الآية تدل على أنه تعلى أمر بالذكر والتبتل، وقال هنا أذكر إسم الله، وفى آية أخرى ،وأذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ، لأنه لابد فى أول الأمر من ذكرالإسم بالسان مدة ﴿أذكر إسم ربك﴾ ثم يزول الإسم ويبفى المسمى، فالدرجة الأولى، هى المراد بقوله﴿ تفسير) ﴿أذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة﴾ والمرتبة الثانية ، هى المراد بقوله﴿ (১৭৮ ص ১৫ الفخرالرازى ج

অর্থ : এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল, আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাওয়াতের 'ইজতেমায়ী আমল' ছেড়ে দিয়ে নিতান্ত একাকী হয়ে 'ইনফিরাদী আমল' 'আল্লাহ' শব্দের যিকির করার আদেশ করে বললেন, أذكر إسم ربك، অর্থ : "হে নবী! আপনার প্রভুর নাম 'আল্লাহ' শব্দের যিকির করুন"। আর অন্য আয়াতে বললেন,وأذكرربك فى نفسك تضرعا وخيفة অর্থ : "হে নবী! আপনি ক্রন্দনরত অবস্থায় ও ভীতাবস্থায় আপনার রবের যিকির করুন"। এর কারণ হল, মু'মিনের প্রথমাবস্থায় একটি সময় পর্যন্ত জবানের শব্দসহকারে আল্লাহ পাকের নাম 'আল্লাহ' শব্দের যিকির করা জরুরী হয়ে থাকে। কারণ জবানে এ ধরণের 'আল্লাহ' শব্দের যিকির বেশী বেশী

করার দ্বারা ধীরে ধীরে আল্লাহ পাকের নামের যিকিরের স্থানে স্বয়ং আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব ও তাঁর সত্তার স্মরণ অন্তরে গেথে যায় এবং তা ভালভাবে অন্তরে বসে যায়। সুতরাং মুরীদের প্রথম অবস্থার যিকিরের নিয়মের বর্ণনা দিয়ে কুরআন পাকে বলা হল,أذكر إسم ربك، অর্থ : "হে নবী! আপনার প্রভুর নাম 'আল্লাহ' শব্দের যিকির করুন" এবং মু'মিনের শেষ পর্যায়ের যিকিরের নিয়মের বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে, وأذكر ربك فى نفسك تضرعاوخيفة অর্থ : "হে নবী! আপনি ক্রন্দনরত অবস্থায় ও ভীত অবস্থায় আপনার রবের যিকির করুন"। (তাফসীরু ফখরির রাজী ১৫ খ. ১৭৮ পৃ.)

আল্লাহ' নামের যিকির দ্বারা নামাজ কবুল হওয়াঃ

(১৫ سورة الاعلي آيت) قد افلح من تذكى، وذكراسم ربه فصلي (৩)

অর্থ : যে ব্যক্তি নফসের পবিত্রতা হাসিল করল সে সফলতা পেল এবং সে রবের নাম "আল্লাহ" শব্দের যিকির করে অতঃপর নামাজ পড়ে। (সুরা আলা, আয়াত ১৫)

নামাজের শুরুতে আল্লাহর নাম দ্বারা নামাজ শুরু করতে হয়। যেমন 'আল্লাহু আকবার' শব্দ বলে নামাজ শুরু করতে হয়। এই নাম নামাজের সর্ব অংশে উচ্চারণ করতে হয়। নামাজে দাড়িয়ে নামাজ শুরু করার সময়, রুকু করার সময়, রুকু থেকে উঠার সময়, সেজদা করার সময়, সেজদা থেকে উঠার সময়, দ্বিতীয় সেজদা করার সময়, দ্বিতীয় সেজদা থেকে উঠার সময়, বসার সময়, দ্বিতীয় রাকাতে উঠার সময় ইত্যাদি অংশে এইভাবে চার রাকাতে কতবার যিকির করতে হয়। এইজন্যই আল্লাহ পাক বললেন, وذكراسم ربه فصلي অর্থাৎ সে তার রবের নাম "আল্লাহ" শব্দের যিকির দ্বারা নামাজ কায়েম করে। এর দ্বারা প্রমাণিত হল, নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও যিকিরের মাধ্যমে আদায় করতে হয়।

এমনকি অনেক নামাজ এমনও রাখা হয়েছে যার নাম রাখা হয়েছে 'সালাতুস তাসবীহ' অর্থাৎ যিকির ও তাসবীহের নামাজ। যে নামাজে চার রাকাতে ৩০০ বার কালেমা সুওম পাঠ করতে হয়। আর কালেমা সুওমে মোট চারটি যিকির রয়েছে। (১) সুবহানাল্লাহ (২) আল-হামদুলিল্লাহ (৩) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (৪) আল্লাহু আকবার। সুতরাং এইভাবে হিসাব করলে মোট চার রাকাতে ১২০০ যিকির হয়ে যাবে। সুতরাং যে নামাজে ১২০০

বার যিকির করতে হয় সেটাকে তো যিকিরের নামাজই বলতে হয়। মোটকথা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হল তাঁর নামের যিকির তাঁর কাছে বেশী প্রিয় এবং তাঁর গুণ বর্ণনা হয় এমন শব্দ তিনি বেশী পছন্দ করেন।

কুরআনে আল্লাহ নামের তাসবীহ পাঠের অদেশঃ

(১ سورة الاعلي آيت) سبح اسم ربك الاعلي (৪)

অর্থ : হে নবী! আপনার মহান রবের নাম "আল্লাহ" শব্দের তাসবীহ পাঠ করুন। (সুরা আলা, আয়াত ১)

ای نزه تسمية ربك وذكرك إياه، أن تذكره إلأَّوأنت خاشع معظم ولذكره محترم وقيل المعنى إرفع صوتك بذكر ربك (التفسير فتح القدير ج ৫ ص ৫২৮)

অর্থ : হে নবী! প্রভুর নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর যিকির করুন। আল্লাহ পাকের যিকির করার সময় আপনার অন্তরে তাঁর বড়ত্ব ও তাঁর সম্মান থাকা উচিত। এ আয়াতের অর্থে আরো বলা হল, আল্লাহ পাকের যিকির উঁচ্চ আওয়াজে ও জোরে জোরে করুন। (ফতহুল কাদীর ৫ খ. ৫২৮ পৃ.)

মহান রবের নাম কি তা জানা থাকলে যিকিরের অপব্যাখ্যা করতে কেউ সাহস করত না। তাই দুঃখের বিষয় হল, রবের নাম যারা জানে না তারা যিকিরের অপব্যাখ্যা করে এবং যিকিরকে বেদআত বলে। তারা বলে, যিকিরের অর্থ হল, আল্লাহ ও রাসূলের বর্ণিত শরীয়তের উপর আমল করা। এর স্বপক্ষে কোন আলেমের মহামূল্যবান বাণীও পেশ করে দেয়। যদিও সে বাণীটি তার আপন স্থানে সঠিক। কারণ আল্লাহ সম্পর্কীয় যে কোন বিষয় তা যিকিরের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তবেকি তা এ আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর নামের যিকিরের স্থান পেতে পারবে? যে 'আল্লাহ' নামের যিকির স্বয়ং আল্লাহ পাক সকাল বিকাল করতে বলেছেন। কক্ষনো নয় তা হতেই পারে না। আর কোন দিন তা হবেও না। মোটকথা কুরআন ও হাদীসের অনেক গবেষণা করে স্পষ্টভাবে একথা পাওয়া গেছে। মুনাফেকদের সম্পর্কে হাদীসে আছে, হে মু'মিনগণ! বেশী বেশী আল্লাহ পাকের যিকির কর। যাতে মুনাফেকরা তোমাদেরকে রিয়াকার ও পাগল বলে।

(বায়হাকী শরীফ, নাতিজাতুল ফিকরি লিস-সুয়ূতী (রহ.) ২ খ. ২৫ পৃ. এবং সিবাহাতুল ফির্ক ৫৫ পৃ.)

আল্লাহর জিকিরে বাধাদানকারী জালেম, অত্যাচারী ও পাপাচার করা হয়ঃ

(১১৪ سورة البقرة آيت) ومن اظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه (৫)

অর্থ : তার চেয়ে বড় জালেম ও অত্যাচারী এবং পাপাচার আর কে হতে পারে যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘর মসজিদসমূহে তাঁর নাম "আল্লাহ" যিকির করতে বাধা দেয়? (অর্থাৎ সেই বড় জালেম ও অত্যাচারী এবং পাপাচার ব্যক্তি) (সূরা বাকারা, আয়াত ১১৪)

واى إمرئ أشد تعديا وجرائة على الله وخلافا لأمره من إمرئ منع مساجد الله أن يعبد الله
(৫৪৫ ص ১ تفسير الطبرى ج) فيها ؟ من أن يذكر إسم الله فى مساجده

অর্থ : তার চেয়ে বেশী সীমালংঘনকারী ও অতিরঞ্জনকারী আর কে হতে পারে যে ব্যক্তি অতি বেশী সাহসী হয়ে মসজিদসমূহে আল্লাহ পাকের নাম 'আল্লাহ' যিকির করার মত ইবাদত করতে বাধা দেয় এবং আল্লাহ পাকের এ আদেশ অমান্যকারী পাপিষ্ঠ হয়। (তাফসীরে তাবারী ১ খ. ৫৪৫ পৃ.)

وهذا الحكم عام لكل مسجد من فعل ذالك فى أي مسجد كان، وإن كان سبب النزول فعل
(১৪৯ ص ১تفسبر أبى السعود ج) طائفة معيَّنة وفى مسجد مخصوص

অর্থ : মসজিদসমূহে যিকির করতে বাধা দেওয়ার মত এমন জঘন্য ও গর্হিত কাজ যে করবে তার ব্যাপারে এই হুশিয়ারী বাণী উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও উক্ত আয়াতটি বিশেষ কোন গোত্রের এবং বিশেষ কোন মসজিদের ক্ষেত্রে নাজিল হয়েছিল। (তাফসীরে আবীস-সউদ ১খ. ১৪৯ পৃ.)

فيشمل جميع ماتمنع من أن يذكر فيها وسعى فى خرابها ؛ فيكون أعم من قوله
الأمور التى بنيت لها المساجد ؛ كتعلم العلم وتعليمه والقعود للإعتكاف وانتظار الصلوة
(১৬৫ ص ১التفسيرفتح القدير ج)

অর্থ : وسعى فى خرابها অর্থ : "যে ব্যক্তি মসজিদসমূহ খারাব করার চেষ্টা করে" মসজিদসমূহে আল্লাহ পাকের নামের যিকির করাসহ সকল দ্বীনী বিষয় থেকে নিষেধ করা এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং যে সকল ধর্মীয় বিষয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে মসজিদসমূহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। মসজিদসমূহে সে সকল দ্বীনী বিষয় থেকে বাধা দেওয়া এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন ধর্মীয় ইলম অর্জন করা ও তা শিক্ষা দেওয়া এবং এ'তেকাফ করা ও নামাজের জন্য অপেক্ষা করা ইত্যাদি। (ফতহুল কাদীর ১ খ. ১৬৫ পৃ.)

আল্লাহর পক্ষ থেকে মসজিদসমূহে যিকির করার অনুমতিঃ

في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا (৬)
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكرالله واقام الصلاة وايتاء الزكوة (سورة النور آيت ৩৬)

অর্থ : মসজিদসমূহের মর্যাদা উন্নতী করার জন্য আল্লাহ পাক আদেশ করেছেন। যে মসজিদসমূহে স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁর নাম 'আল্লাহ' যিকির করার আদেশ করেছেন। সে মসজিদসমূহে এমন সব লোক সকাল সন্ধ্যা তাসবীহ পাঠ করেন ও যিকির করেন, যাদেরকে ব্যবসা বানিজ্য নামাজ কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে বাধা সৃষ্টি করে না। (সুরা নূর, আয়াত ৩৬)

المساجد تكرم وتنهى عن اللغو فيها ويذكر فيها اسم الله (التفسير فتح القدير ج 8 ص ৪৬)

অর্থ : মসজিদসমূহকে সম্মান করতে হবে ও মসজিদে দ্বীন বিরোধী কাজ করা যাবে না এবং মসজিদসমূহে আল্লাহ পাকের নাম 'আল্লাহ' যিকির করতে হবে। (ফতহুল কাদীর ৪ খ. ৪৬ পৃ.)

اى المساجد المرفوعة لذكرالله اراد الله أن ترفع وأن تكون خاصة تুاذن الله أن ترفع্থ্
لذكره جل شانه (التفسير الواضح ج ২ ص ৬৮৫)

অর্থ : "মসজিদসমূহের উন্নতি করার অনুমতি আল্লাহ পাক দিয়েছেন"। অর্থাৎ যে সব মসজিদ নির্মাণ হয়ে গেছে সে সব মসজিদের উন্নতি যিকির করার দ্বারা বলে আল্লাহ পাক একথা বলতে চান, যেন (তাফসীরুল ওয়াজেহ ২খ.৬৮৫ পৃ.)

আল্লাহর নামের যিকির তাঁর বড়ত্ব সহকারে করা উচিত:

(৭) فسبح باسم ربك العظيم (سورة الواقعة آيت ৯৬)

অর্থ : হে নবী! আপনার মহান রবের নাম "আল্লাহ" শব্দের তাসবীহ পাঠ করুন। (সুরা ওয়াকিয়াহ, আয়াত ৭৪)

এ আয়াতে বলা হয়েছে, হে নবী! আপনি আপনার মহান প্রভুর নামের তাসবীহ পাঠ করুন। এ আয়াতে প্রভুর নামের তাসবীহ ও যিকির করার আদেশ করা হয়েছে। প্রভুর নাম যারা জানে না তারা এ তাসবীহের বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা করে থাকেন। তাই প্রভুর নামের তাসবীহ ও যিকির করাকে যদি কুরআন তেলাওয়াত করা বলা হয় তাহলে তা যে কতবড় অজ্ঞতা ও ধৃষ্টতা হবে তা জ্ঞানী মহল বলবেন। কুরআনের অপব্যাখ্যা ও অপপ্রচার হওয়ায় তাদের আখেরাতে কি পরিণতি হতে পারে তাও তারা ভালভাবে ব্যাক্ত করবেন। প্রভুর নামের তাসবীহ ও যিকির করাকে যদি দোয়া দুরুদ পাঠ করাকে বলা হয় তার উত্তরও তারাই দিবেন। প্রভুর নামের তাসবীহ ও যিকির করা যদি নামাজ আদায় করাকে বলা হয় তাহলে এমন অজ্ঞ লোকদের উত্তর না দেওয়াই সঠিক ইলম ও আসল জ্ঞানের পরিচয়। যদিও শুধু তাসবীহ শব্দ দ্বারা অনেক স্থানে নামাজকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কিন্তু প্রভুর নামের তাসবীহকে নামাজ শব্দে ব্যাখ্যা করা নিতান্ত ঈমান ইসলাম বিরোধী মনভাবের আলামত ছাড়া আর কি হতে পারে?

মসজিদই আল্লাহ নামের যিকির করার স্থানঃ

(৮) ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله (سورة الحج آيت ৪০)

অর্থ : আল্লাহ পাক যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন। তাহলে খ্রীষ্টানদের গির্জা ও ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মুসলমানদের মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত। যে উপাসনালয় গুলোতে আল্লাহর নাম "আল্লাহ" শব্দের যিকির করা হয়ে থাকে। (সুরা হজ্জ, আয়াত ৪০)

كنائس النصارى তুصلوات্থ্ مساجد اليهود তুبيع্থ্ يكون فيها الرهبان তুصوامع্থ্
قال الضحاك رح فى كل তুيذكر فيها إسم الله كثيرا্থ্ مساجد المسلمين তুالمساجد্থ্
(৫১৭ ص ১০ الدر المنثور ج) هنا يذكر إسم الله كثيرا

অর্থ : 'সাওয়ামে' খানকাসমূহ, 'বিয়া' ইহুদীদের মসজিদসমূহ, 'সালাওয়াত' খৃষ্টানদের গির্জাসমূহ, 'মসজিদ' মু'মিনগণের মসজিদসমূহ। এ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আল্লাহ পাকের যিকির বেশী বেশী করতে হবে। এ আয়াতের তাফসীরে হযরত জাহ্হাক (রহ.) বলেন, উক্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে আল্লাহ পাকের নাম 'আল্লাহ' শব্দের যিকির বেশী বেশী করার আদেশ করা হয়েছে। (তাফসীরে দুররুল মানসুর ১০ খ. ৫১৭ পৃ.)

উপরের আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলার নামের যিকির করতে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ বা রবের যিকির করার কথা বলা হয়নি। সুতরাং এ আয়াত দ্বারাও স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, আল্লাহ পাকের নাম 'আল্লাহ' শব্দের যিকির করা গুরুত্ত্বপূর্ণ ইবাদত যা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আদেশ করা হয়েছে। তাফসীরে মাযহারীতে আছে, "ইসমে যাত" বা 'আল্লাহ' নামের যিকির অর্থাৎ বার-বার "আল্লাহ" "আল্লাহ" এই শব্দ বলা ও যিকির করা আল্লাহ পাকের আদেশ যা গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম ইবাদত হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। তাই এ আয়াতে "اسم" শব্দ উল্লেখ করেছেوَاذْكُرْاِسْمَ رَبِّكَ অথাৎ "আপনার রবের নাম 'আল্লাহ' শব্দের যিকির করুন" বলা হয়েছে। وَاذْكُرْ رَبَّكَ অর্থাৎ "আপনার রবের স্মরণ করুন" এ কথা বলা হয়নি। এ থেকে বুঝা যায়, "ইসমে যাত" অর্থাৎ 'আল্লাহ' শব্দ বার-বার উচ্চারণ করা ও এই নামের যিকির করা কত বেশী গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হয়ে থাকবে তা অতি সহজে অনুমেয়। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই এই নামের যিকির করার আদেশ করা হয়েছে। (তাফসীরে মাযহারী, তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন)

তাইতো কুতুবুল ইরশাদ ও কুতুবুল আলম শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.) হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া (রহ.) ও হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহ.)কে একদা ডেকে বললেন, আল্লাহ নামের যিকির অমনোযোগীতার সাথে করা হোক না কেন তা ফায়দা থেকে খালি নয় এবং এর কোন না কোন প্রভাব অন্তরে অবশ্যই হবে।

এ জন্য বুর্যুগগণ তাঁদের দোস্ত-আহবাব, ভক্ত-মুরীদগণকে অন্যান্য যিকিরের সাথে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' শব্দের যিকির করারও আদেশ করে থাকেন। যেমন হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানভী (রহ.) তাঁর কোন কোন মুরীদদেরকে দৈনিক সকাল বিকাল ১২ হাজার থেকে ২৪ হাজার বার পর্যন্ত 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' নামের যিকির করার আদেশ করতেন এবং এ নামের যিকির করার নিয়মও তিনি শিক্ষা দিতেন। (কসদুস সাবীল)

শুধু 'আল্লাহ'' নামের যিকির সম্পর্কেঃ

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা জাকারিয়া (রহ.) বলেন, শুধু 'আল্লাল,আল্লাহ,' যিকির করার ব্যাপারে অনেকে প্রশ্ন করে থাকে। তারা বলে, শুধু 'আল্লাহ-আল্লাহ' যিকির করা হল একটা একক শব্দ, যা দ্বারা না পূর্বের কোন সংবাদ বুঝা যায়। আর না বর্তমানের কোন অবস্থা বুঝা যায়। সুতরাং এ অর্থহীন শব্দের যিকির করে কি লাভ হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন,

হাদীসে শুধু 'আল্লাহ' শব্দের যিকির করা অর্থবহ ও গ্রহণযোগ্য ইবাদত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুসলিম শরীফে আছে, পৃথিবীতে যতদিন 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' যিকিরকারী একজন লোকও থাকবেন। ততদিন পর্যন্ত কেয়ামত কায়েম হবে না। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, শুধু 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' নামের যিকির করা ও বার-বার 'আল্লাহ' শব্দ উচ্চারণ করা শরীয়তসম্মত ও আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে আদেশ এবং তাতে অনেক বরকতও রয়েছে। এ নামের বরকত কোন অর্থবহ শব্দ হওয়ার উপর নির্ভর করে না। তদুপরী এ নামের যিকির করা দ্বারা যদি আল্লল্লাহ পাকের ধ্যান খেয়াল পয়দা করা উদ্দেশ্য হয়। তাহলে এটা অর্থহীন ও অনুপকারী কেন হবে? বরং এটা শরীয়তে আদেশ করা হয়েছে। বিধায় তা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে।

سبحان الله 'সুবহানাল্লাহ' বা এধরণের শব্দ পূর্ণ বাক্য নয়। বরং এ সব শব্দের আগে ও পরে আরো কিছু শব্দ উহ্য বা গোপন থাকে। কেননা سبحان সুবহান এর ক্ষেত্রে سبحت (সাব্বাহতু) বা اسبح (উসাব্বিহু) শব্দ উহ্য ও গোপন থাকে। আর এধরণের উদাহরণ কুরআনে অনেক রয়েছে। যেমন সূরা ইউসুফে আছে يوسف اعرض عن هذا ইউসুফ এ থেকে বিরত থাক! এখানে মূল ছিল يايوسف اعرض عن هذا হে ইউসুফ! এ থেকে

বিরত থাক। তদ্রুপ শুধু 'আল্লাহ' শব্দের আগে হয় يا (হে) বা ادعو (ডাকছি) ইত্যাদি শব্দ গোপন থাকে। সুতরাং শুধু 'আল্লাহ' নাম বললে তার অর্থ হবে 'হে আল্লাহ' তাই শুধু 'আল্লাহ' নাম দ্বারা যিকির করা ইবাদত এতে কোন সন্দেহ নেই। (আত্তাকশীফ পৃ.৭০২)

শুধু 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' জিকির করা যায় তার ব্যাখ্যাঃ

আরবী ভাষায় কখনো কখনো বাক্যের এক অংশ উহ্য বা গোপন রেখে বাকি অংশ উল্লেখ করা হয়। যেমন হযরত বেলাল (রা.) শুধু احد-احد (এক-এক) বলে ছিলেন। অর্থাৎ আমার রব একক তাঁর কোন শরীক নেই।

নতুন চাঁদ দেখার সময় هذا هلال (এই যে চাঁদ) এর স্থলে শুধু هلال- هلال চাঁদ-চাঁদ বলার প্রচলন চলে আসছে। তদ্রুপ 'আল্লাহ' শব্দের পরে رازق قادر - خالق ইত্যাদি শব্দ গোপন থাকে। তাই যখন 'আল্লাহ' শব্দ বলা হয় তখন তার আগে বা পরে একটি শব্দ গোপন থাকে। সুতরাং শুধু 'আল্লাহ' শব্দ দ্বারা যিকির করলে তার অর্থ পরিপূর্ণ হয়। শুধু 'আল্লাহ' শব্দ দ্বারা যিকির করা শরীয়ত ও ব্যাকরণের দিক দিয়ে কোন অসুবিধা হবে না।

হাকীমুল উম্মত মুজ্জাদ্দেদে মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এর মতামত:

হাকীমুল উম্মত মুজ্জাদ্দেদে মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী (রহ.) "বাওয়াদেরুন নাওয়াদের" নামক কিতাবে লিখেছেন। এ ব্যাপারে যথার্থ কথা হল, যেমনিভাবে কুরআন পাক পড়ার উদ্দেশ্য হয় দুইটি (১) তেলাওয়াত করা (২) ও মুখস্ত করা। কুরআন পাক পড়ার উদ্দেশ্য যদি শুধু তেলাওয়াত করা হয় তাহলে হাদীসে বর্ণিত নিয়মের পাবন্দী করে পড়া জরুরী অন্যথায় তা হবে বেদআত। পক্ষান্তরে কুরআন পাক পড়ার উদ্দেশ্য যদি মুখস্ত করা ও অন্তরে গেঁথে নেওয়া হয়। তাহলে সে নিয়মের পাবন্দী করা জরুরী নয়। যেমন কেউ এক একটা শব্দ বার-বার পড়ে মুখস্ত করে। আবার কেউ এক একটা 'বাক্য' বার-বার পড়ে মুখস্ত করে। আবার অনেকে এক একটা 'আয়াত' বার-বার পড়ে মুখস্ত করে। এভাবে কুরআন মুখস্ত করা বেদআত নয়।

এক্ষেত্রে এটা দেখার প্রয়োজন নেই, সাহাবা কেরাম (রা.) বা পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ কিভাবে কুরআন পাক মুখস্ত করতেন।

তেমনিভাবে যিকির করার দ্বারাও উদ্দেশ্য হল দুইটি (১) মূল যিকির দ্বারা ইবাদত করা উদ্দেশ্য হয়। (২) যিকির করার দ্বারা আল্লাহর স্মরণ দিলের মধ্যে মজবুত করা উদ্দেশ্য হয়। তখন যিকির দ্বারা ইবাদত করা উদ্দেশ্য থাকে না। তাই যিকির দ্বারা যদি ইবাদত উদ্দেশ্য হয়। সে ক্ষেত্রে হাদীসে বর্ণিত যিকির ও তার নিয়মের পাবন্দী করতে হবে। আর যিকির দ্বারা যদি আল্লাহর স্মরণ দিলের মধ্যে মজবুত করা উদ্দেশ্য হয়। আর সে স্মরণ কোন ইবাদতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। তখন সে ধরণের যিকির করতে হাদীসে বর্ণিত কোন নিয়মের পাবন্দী করা জরুরী নয়। বরং অন্তরে একটা বিশেষ অবস্থা আল্লাহর ভালবাসা ও তাঁর স্মরণ সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য। সুতরাং 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বার-বার বলার দ্বারা ইবাদতের যিকির উদ্দেশ্য হয় না। বরং তা দ্বারা অন্তরে বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য হয় এবং অন্তরে আল্লাহ পাকের স্মরণ হাসিল করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর তাহল ধীরে ধীরে মাখলূকের ধ্যান দিল থেকে দূর করে আল্লাহ পাকের মহব্বত ও ভালবাসা অন্তরে প্রবেশ করানো। তাই প্রথমে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে মাখলুককে দিল থেকে বের করে দেওয়া এবং 'ইল্লাল্লাহ' বার-বার বলার দ্বারা আল্লাহ পাকের মহব্বত দিলে গেঁথে নেওয়া। আর এটা এক ধরণের বাতেনী সম্পর্ক ও নিসবত। তাই এর থেকে একটু আগে বেড়ে শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সত্ত্বার ধ্যান মস্তিষ্কে গেঁথে নেওয়ার জন্য এ যিকিরগুলোকে নিয়মিতভাবে করা হয়। যা দ্বারা আল্লাহর সাথে পরিপূর্ণ সর্ম্পক হাসিল হয়। যার ফলে মাখলূক থেকে দিল পাক পবিত্র হয়ে যায় এবং আল্লাহ পাকের মহব্বত ও ভালবাসা অন্তরে সৃষ্টি হয়। পরে এ অবস্থা পরিপক্ক হয়ে কামেল যিকির সারাক্ষণ আল্লাহর ধ্যান খেয়াল কায়েম করার হক আদায় হয়ে যায়। আল্লাহ পাকের ভালবাসা লাভে ধন্য হওয়া যায় আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে এ বর্ণনা দ্বারা যিকির সংক্রান্ত সব অভিযোগ দূর হয়ে যাবে এবং একথা প্রমাণিত হবে যে, যারা আল্লাহ নামের যিকির করাকে বেদআত বলে, তারা নিজেদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণেই বলে থাকে।

الحمد لله ما القى ولقن والهم

এখন প্রশ্ন হল, শুধু আল্লাহ শব্দের যিকির করলে নেকী পাওয়া যাবে কিনা?

এ প্রশ্নের উত্তরের আগে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ মুখস্ত করার সময় এক একটা শব্দকে বার-বার পড়েন সে এতে সওয়াব পাবেন কি না? এ প্রশ্নের উত্তর যা হবে, শুধু আল্লাহ শব্দের যিকিরের প্রশ্নের উত্তরেও তাই হবে। তদুপরি এ উভয় প্রশ্নের উত্তর এভাবেও দেওয়া যায়, এ ক্ষেত্রে তেলাওয়াত ও যিকিরের সওয়াব না পেলেও যেহেতু এর দ্বারা পরিপূর্ণ তেলাওয়াত ও পরিপূর্ণ যিকিরের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই চেষ্টার সওয়াব তো অবশ্যই পাওয়া যাবে। (শরীয়ত ও তরীকত ১৭৩ পৃ.)

সারকথা : আল্লাহর নাম, শুধু 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' যিকির করা যে আল্লাহ পাকের আদেশ তার প্রমাণে চলমান এ কিতাবের যিকিরের অধ্যায়ের শুরুতে আটটি আয়াত ও দুইটি হাদীস এবং অন্যান্য দলীল প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এর একটি আয়াত বা একটি হাদীস কোন বিষয় প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। তারপর যে বিষয়ের উপর অনেকগুলো আয়াত ও হাদীস বিদ্যমান এবং আকাবের বুযুর্গগণ থেকে এর প্রমাণ ও আমল বিদ্যমান। সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা বা না জায়েয ও বেদআত বলা যে কত বড় অপরাধ তা সহজেই বুঝা যায় এবং একথাও বুঝা যায় যে, তারা কুরআন হাদীস ও আকাবের বুযুর্গগণের জীবনী ও আমল সম্পর্কে কত বেশী অন্ধ ও অজ্ঞ। কারণ স্বয়ং কুরআন পাকে আল্লাহ পাক আটটি আয়াতে তাঁর নাম 'আল্লাহ' শব্দের যিকির করার আদেশ করেছেন। সুতরাং যারা তাঁদের রবের নাম জানবেন তাঁরা জ্ঞানী ও বিজ্ঞ হবেন এবং তাঁরা সে নামের যিকির করবেন। পক্ষান্তরে যারা তাদের রবের নাম কি তা জানবেন না তারা অজ্ঞ ও মুর্খ হবে। তাই তারা 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' যিকির করাকে বেদআত বলবে। আর যিকিরকারীদেরকে বেদআতী বলবে ও খারাপ চোখে দেখবে। বর্তমান বিশ্বে অল্প কিছু মানুষ আল্লাহর যিকির করেন। আর বেশীর ভাগ যিকির করে না। সে বেশীরভাগ মানুষ যিকির করাকে বেদআত ফতোয়া দিয়ে থাকে। যিকিরকারীদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ হল, শতকরা একজন মানুষ যখন জান্নাতী হবেন। তখন তারাই যিকির করে জান্নাতে যাওয়ার সৌভাগ্য হাসিল করতে পারবেন। আল্লাহ পাক সঠিক বিষয় জেনে তার অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

ইসমে আজমঃ

ইসমে আজম হলো আল্লাহ তায়ালার বড় নাম বা নামের মহত্ত্ব। ইসমে আজম নির্ধারণের ব্যাপারে রেওয়ায়াতে বিভিন্ন ধরনের বর্ণিত হয়েছে। আসলে আল্লাহ তায়ালার নিয়ম এই যে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অস্পষ্ট রাখিয়া উহাতে মতভেদ সৃষ্টি করিয়া দেন। যেমন, শবে কদরের নির্ধারণ আর জুমার দিন দোয়া কবুল হওয়ার নির্দিষ্ট সময় সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে।ইহাতে অনেক হেকমত ও কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। তদ্রুপ ইসমে আজমের নির্দিষ্টতা সম্পর্কেও বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে।

আল্লাহর বড় নাম ধরে মহান আল্লাহকে ডাকলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ফায়দা হয়। তবে ইসমে আজম বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হতে পারে যেমন, বিপাদাপাদের ক্ষেত্রে ইসমে আজম, অবাধ্য ও অনিষ্ঠকারী শয়তানের জন্য ইসমে আজম এবং পাগল, বদনজর ও শিশুদের ভয়ের ক্ষেত্রে ইসমে আজম এবং আল্লাহর সাথে সান্নিধ্যের ইসমে আজম। নিচে আমরা এর ব্যাখ্যাই যাই :

(১) বিপদ আপাদ ও দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে ইসমে আজম :

হযরত আসমা (রাযিঃ) হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলার বড় নাম (যাহা সাধারণতঃ ইসমে আজম নামে প্রসিদ্ধ) এই দুই আয়াতের মধ্যে রহিয়াছে। (যদি উহা ইতিহাসের সহিত পড়া হয়)ঃ
والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم
সূরা বাকারা, রুকু -**১৯**

এবং

الم الله لا اله الا هو الحى القيوم
সুরা আলে ইমরান -রুকু-**১**

ইহা পাঠ করিয়া যেকোনো দোয়া করা হয় তাহা আল্লাহ দরবারে কবুল হয়।

(২) অবাধ্য ও অনিষ্ঠকারী শয়তানের জন্য ইসমে আজমঃ

হযরত আনাড(রাযিঃ) নবী করিম সাঃ থেকে বর্ণনা করেন, অবাধ্য ও অনিষ্টকারী শয়তানের জন্য উপরে উল্লেখিত এই দুইটি আয়াতের চাইতে কঠিন আর কোন আয়াত নাই।

(৩) পাগলামি ও বদনজরের ক্ষেত্রে ইসমে আজমঃ

ইব্রাহিম ইবনে আসমা(রহঃ) বলেন,পাগলামি বদনজর ইত্যাদি নিরাময়ের জন্য নিম্ন বর্ণিত আয়াতগুলি খুবই উপকারী, যে ব্যক্তি এই আয়াতগুলি নিয়মিত পাঠ করিবে সে এই ধরনের সমস্যা হইতে নিরাপদে থাকিবে:

(ক) والهكم اله واحد পূর্ণ আয়াত(সূরা বাকারাহ, রুকু:১৯)
(খ) আয়াতুল কুরসী
(গ) সূরা বাকারার শেষ আয়াত
(ঘ) ان ربكم الله الذى خلق হইতে محسنين পর্যন্ত।
(ঙ) সূরা হাশরের শেষ ৩ আয়াত।

(৪) শিশুদের ভয় ও বদনজরের ক্ষেত্রে ইসমে আজমঃ

ইব্রাহিম ইবনে দাসমা (রহ:) ইহাও বলিতেন যে, শিশুদের ভয় অথবা বদনজরের আশঙ্কা হইলে তাহাদের জন্য এই আয়াত গুলি লিখিয়া দাও।

(৫) মহান আল্লাহর সাথে সান্নিধ্যের ইসমে আজমঃ

আল্লামা শামী (রহ:) ইমাম আবু হানিফা (রহ:) হইতে নকল করিয়াছেন, ইসমে আজম হইল স্বয়ং 'আল্লাহ ' শব্দটি। তিনি আরো লিখেছেন যে আল্লামা তাহাবী (রহ:) ও অনেক ওলামায়ে কেরাম হইতে এই একই উক্তি নকল করা হইয়াছে এবং অধিকাংশ

আরেফিন তথা বিশিষ্ট সুফি গণও একই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। এজন্যই তাহাদের নিকট এই পবিত্র নামের জিকিরই অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে।

শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী(রহ:) হইতে ইহাই বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনি বলেন, ইসমে আজম হইল 'আল্লাহ' শব্দটি। তবে শর্ত হইল যখন তুমি এই পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবে তখন যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু তোমার অন্তরে না থাকে। তিনি আরো বলেন সাধারণ লোক এই নাম এমন ভাবে লইবে যে,

যখন ইয়া জবানে জারি হইবে তখন অন্তরে আল্লাহর আজমত ও ভয় থাকিতে হইবে। আর খাস লোকেরা এই নাম এমন ভাবে উচ্চারণ করিবে যে, তাহাদের অন্তরে আল্লাহর জাত ও সিফাতের উপস্থিতি থাকতে হইবে।আর খাস লোকদের মধ্যে যাহারা আরো খাস, তাহাদের জন্য শর্ত হইল, ওই পাক জাত ছাড়া তাহাদের অন্তরে যেন আর কিছু না থাকে। আর কোরআন শরীফে ও এই মোবারক নাম এত অধিক পরিমাণে উল্লেখ করা হইয়াছে যে তাহার সীমা নাই, যাহার পরিমাণ ২৩৬০ বলা হইয়াছে।

ইসমে আজম নিয়ে বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরে ইবনে কাসীরে বর্ণিত মতামতঃ

'আল্লাহ' শব্দটি মহাবিশ্বের একমাত্র মহান প্রতিপালক মহাপ্রভুর নাম। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম বলেন উহাই 'ইসমে আজম'।কারণ, আল্লাহ শব্দের মধ্যে সকল গুণের সমাবেশ ঘটিয়াছে। যেমন,আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

هو الله الذى لا اله الا هو- عالم الغيب و اشهادة هو الرمن الرحيم- هو الله الذى لا اله الا هو- الملك القدوس السلام الموء من المهيمن العزيز الجبار المتكبر- سبحان الله عما يشركون- هو الله الخالق البارءى المصور له الاسماء الحسنى - يسبح له مافى السموت ولارض وهو العزيز الحكيم-

('আল্লাহ' হইতেছেন সেই সত্তা যিনি ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই। তুনি দৃশ্য- অদৃশ্য সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত। তিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। আল্লাহ হইতেছেন সেই সত্তা যিনি ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই। তিনি সর্বোত্তম ক্ষমতার অধিকারী, পবিত্র শান্তিদাতা, আশ্রয়দাতা, রক্ষক, মহা পরাক্রমশালী, মহা ক্ষমতা বান, সর্বোন্নত মর্যাদার অধিকারী। মানুষ তাহার শহীত যাহাদিগকে অংশীদার বানায়, তাহাদের হইতে তিনি

পূর্ণমাত্রায় পবিত্র। আল্লাহ হইতেছেন সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক, শ্রেষ্ঠতম রুপদাতা, তাহার সুন্দর সুন্দর গুণবাচক নাম রহিয়াছে। আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সকল কিছুই তাহার পবিত্রতা- মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন। তিনি মহা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা উল্লেখিত অন্যান্য সকল গুণকে 'আল্লাহ' এর সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। অনুরূপভাবে অন্যত্র বলিয়াছেন, আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম রহিয়াছে, তোমরা সেই সব নামেও ডাকতে পারো।

মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে আরও বলেন-

قل ادعو الله او ادعو الرحمن اياما تدعوا فله الاسماء الحسنى

"হে নবী আপনি বলিয়া দিন 'আল্লাহ' নামে ডাক আর 'রহমান' নামে ডাক, যাহাকেই ডাকনা কেন উহায় উত্তম , তাহার সুন্দর সুন্দর নাম রহিয়াছে। "

' আল্লাহ' একটি অনন্য নাম। মহাবিশ্বে একক মহান প্রতিপালক প্রভু ভিন্ন অন্য কেহ উক্ত নামে অভিহিত নহে। আল্লাহ সুন্দর সুন্দর নাম দিয়ে তারই সৃষ্টি আশরাফুল মাখলুখের নাম রাখা যায় কিন্তু 'আল্লাহ' নাম দিয়ে কাউকে ডাকা যাবে না। এটা আল্লাহর জাত ও সিফতগত নাম। এ নামের মহত্ব অনেক। এই নাম শুধুমাত্র মহান প্রভুরই হতে পারে।

ইমাম শাফিঈ,খত্তাবি, ইমামুল হারামাইন, ইমাম গাজ্জালী প্রমুখ ব্যক্তিগণ 'আল্লাহ' শব্দকে اسم جامد বলিয়াছেন। যাহা গঠনগত দিক দিয়া একক শব্দ।

এমন একটি শব্দকে اسم جامد বলা হয়, যা অন্য কোন শব্দ থেকে গঠিত হয় না এবং উহা হইতেও কোন শব্দ গঠিত হয় না।

প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ খলিল ও সিবওয়াই বলেনঃ الله শব্দের অন্তর্গত আলিফ ও লাম উহার অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রমাণ স্বরূপ খাত্তাবী এই উদাহরণ পেশ করেন যে,

সম্বোধনে আমরা يا الله 'ইয়া আল্লাহ' বলিয়া থাকি। এখানে আলিফ ও লামসহ বলি কিন্তু গুণবাচক নামের ক্ষেত্রে يا الرحمن 'ইয়া আর রহমান' বলি না। এখানে আলিফ ও লাম বাদ দিয়ে ইয়া রহমান বলি।

উপরোক্ত ব্যাখ্যাগুলো সবই তাফসিরে ইবনে কাছীরে এসেছে।

ইসমে আজমের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সাথে সান্নিধ্যের সম্পর্ক তৈরি হয়। মা'রিফত লাভ হয়, এই মহাজগৎ, ইহজগৎ ও পরজগৎ সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট ধারনা লাভ হয়।

এ সম্পর্কে ইমাম রাযী (রহ:) বলেনঃ জগতে দুই শ্রেণির মানুষ রহিয়াছে। একশ্রেণীর মানুষ আল্লাহ তাআলার মারিফাত ও পরিচয়ের মহাসমুদ্রে পৌঁছিয়া তথায় বিচরণ ও পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান। তাহারা আল্লাহর নূর ও জ্যোতির জগতে মহাসুখে ঘুরিয়া বেড়ান। আরেক শ্রেণীর লোক আল্লাহ তা'আলার মারিফাত হইতে বঞ্চিত থাকিয়া বিভ্রান্তির অন্ধকারে হয়রান ও পেরেশান অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়ায়।এই দুই শ্রেণীর মানুষ আধ্যাত্মিক জগতের দুই মেরুতে অবস্থান করিলেও একটি বিষয়ে তাহাদের মধ্যে মিল ও সাদৃশ্য রহিয়াছে। উহা এই যে উ ভাই সেরে নেই আধ্যাত্মিক জগতের ঘূর্ণায়মান ও পরিক্রমশীল রহিয়াছে। তবে এক শ্রেণীর জন্য সেই পরিক্রমা ও ঘূর্ণন সুখকর আরেক শ্রেণীর জন্য দুঃখজনক।
-(তাফসীরে ইবনে কাছীরের প্রথম খন্ডে বর্ণিত)

আর এই মা'রেফত লাভের উপায় হলো অধিক পরিমানে 'আল্লাহ' নামের জিকির, ফিকির ও মোরাকাবা করা।যেমন-

واذكراسم ربك وتبتل اليه تبتيلا

-" তুমি তোমার রবের নাম স্মরণ করো এবং তাতে মগ্ন হয়ে যাও।"
-(সূরা মুজাম্মিল- আয়াত-৮)

এখানে রবের নাম স্মরণ করতে বলার পাশাপাশি ধ্যানস্তও হতে বলা হয়েছে। আর আমরা জানি মহান আল্লাহর জাত ও সিফাতগত নাম হলো 'আল্লাহ'। আর এখানে اسم দিয়ে 'আল্লাহ' নামকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আসমাউল হুসনা নামে অন্য গুণবাচক নামকে বুঝানো হয়েছে।

তাছাড়া সূরা মুজাম্মিলের এই আয়াতের আগে ও পরের আয়াতে আলাদাভাবে নামাজ, কোরআন তেলাওয়াত এবং দিনের বেলার বিভিন্ন কর্মব্যস্ততার কথা বোঝানো হয়েছে। তাই সূরা মুজাম্মিলের ৮ নং আয়াতে এটা বলার সুযোগ নাই যে এটাকে নামাজ বা অন্য কেন জিকিরের কথা বলা হচ্ছে।

তাছাড়া الله শব্দটিকে খন্ড খন্ড করিলেও প্রতিটি অক্ষর থেকে الله শব্দে মহাত্ব প্রকাশ পায়।যেমন: ا হরফ বাদ দিলে لله ما فى السموت.....। ال হরফ বাদ দিলে له থেকে الله প্রকাশ পায়। আবার الل হরফ বাদ দিলেও ه থেকেও الله নাম প্রকাশ পায়।

তাই আমরা এ কথা বলতে পারি যে, স্বয়ং 'আল্লাহ' নামটি হলো ইসমে আজম। যাহা একনিষ্ঠের সাথে জপিলে মা'রিফত জগতে রহস্য ও জ্ঞানতত্ত্ব প্রকাশ পায়। তখন মহান আল্লাহকে প্রকৃতভাবেই চেনা যায়। এই সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে তার সামগ্রিক জ্ঞান আসে। তখন বান্দা মহান আল্লাহর মোহাব্বতে পড়ে যায়। যার কারণে তার অন্তর থেকে দুনিয়ার মোহাব্বত দূর হয়ে যায়।সে যাহা কিছু করে আল্লাহর জন্যই করে, আর যাহা ত্যাগ করে তাও আল্লাহর জন্যই করে।

এই হালতে...

সে যখন জিহাদে যায়, তার মধ্যে জিহাদি রুব তৈরি হয়।

সে যখন নামাজ পড়ে, নামাজের মধ্যে আল্লাহর সান্নিধ্যের রুব তৈরি হয়।

সে যখন জিকির করে, তার মধ্যে মোহাব্বতের রুব তৈরি হয়।

ইসমে আজমের উপকারিতাঃ

ইসমে আজম হল আল্লাহর সাথে সম্পর্কের এক বিশেষ আমল।যে আমল বান্দাকে দুনিয়ার মোহাব্বত থেকে দূরে রেখে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যের এক বিশেষ সম্পর্কের দিকে ধাবিত করে। যে সম্পর্ক মহান আল্লাহর সব ধরনের হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেকে তৈরি করে দেয়।

এটা হলো ভিতর থেকে একজন মুসলমানকে মুমিন বানায়, বিনয়ী বানায়। এগুলো যারা গ্রহণ করে তাদের স্বামীর সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি হয়,সন্তানরা পিতা মাতার অনুগত হয়। শ্বশুর শ্বাশুড়ি যতই খারাপ হোক না কেন, কোন দিন ঝগড়া হবে না, ধীরে ধীরে সম্পর্ক সুন্দর হয়ে যাবে। কোনদিন কাউকে এমনভাবে কথা বলবে না যে,সে মনে মনে কষ্ট পায়, অথচ নিজে কষ্ট পেলেও। কোন শিক্ষা বা আমল বা কারর কোন ত্রুটির কথা বলতে গেলেও হিকমতের সাথে বলবে। প্রতিবেশীর আত্মীয় স্বজনদের সাথে বিনয়ী সম্পর্ক থাকবে। সকলের প্রতি কল্যানকামী চিন্তা করে। কখনও কারর খারাপ চিন্তা করে না, যদিও তাকে কেউ ক্ষতি গ্রস্ত করে। উম্মতের দরদী মন তৈরি হয়। উম্মতের মুক্তির জন্য মহান প্রভুর কাছে চোখের পানি ঝরায়।

এটা এমন একটা বিষয় যা প্রত্যেকের গ্রহণ করা উচিৎ সে যেদলেরই হোক না কেন? তাহলে সমাজে ইসলাম কায়েম হতে সহজ হয়ে যেতো।

এটা হলো উত্তম আচরণ শিক্ষা। মানুষের কলব পবিত্র হওয়া শিক্ষা, যেটা সমস্ত গোটা দেহসহ তার জগৎ পবিত্র হওয়া।

প্রতিটি ইসলামি দল কোন কোন একটা বিষয়কে অধিক গুরুত্ব দিয়ে মুমিন হওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু দেখবেন তাদের একটা সাইট দেখে মনে হবে খাটি মুমিনের স্তরে অথচ ভিতরের অবস্থা দেখলে বুঝতে পারবেন কত ত্রুটি একজন মুমিন হওয়ার ক্ষেত্রে।

মানুষ আল্লাহকে জেনে ইবাদত করে । এজন্য সে জানে এটা ফরজ করতে হবে আর এটা নিষেধ করা যাবে না। কিন্তু মানুষ যদি আল্লাহকে চিনতো এবং চিনে আমল করত তখন মানুষের হালত পরিবর্তন হয়ে যেতো। তার ভিতর বাহির সব কাজে মৌমিনতা প্রকাশ পেতো।

কিন্তু এটা সবার জন্য কঠিন। মুখে উচ্চস্বরে বলা যায় ইসলাম ইসলাম কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে বড়ই কঠিন।

এখানে অনেক ধৈর্য ও ত্যাগের প্রয়োজন। তবে বিনয়ী হওয়া ছাড়া সম্ভব নয়।সূরা বাকারায় মহান আল্লাহ বলেন- "তোমরা নামাজ এবং ধৈর্য্যের মাধ্যমে আমার কাছে সাহায্য চাও কিন্তু বিনয়ীরা ছাড়া পারে না।"

আল্লাহই বলেছেন বিনয়ীরা ছাড়া পারেনা।
আর এটা হলো সেই বিনয়ী হওয়ার বিশেষ আমল।যে আমল থেকে শয়তান মানুষকে হঠায়ছে।এটা আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার আমল।

এ আমলে ঢুকলে মানুষ তার নিজের ভুল নিজেই দেখতে পারবে। এখনকার মানুষ নিজের ভুল দেখতে পায় না কিন্তু অন্যের ভুল তৎক্ষনাি‌ক দেখতে পায়।

এটা সেই আমল যে আমলে আমক আখলাখ আচার আচরণ সবই হুযুর পাক সাঃ এর মতই হয়ে যাবে, কি পুরুষ আর কি নারী.......।

ইসমে আজম শিক্ষা করার মহাত্বঃ

ইসমে আজম বান্দার অন্তরে এক খোদোায়ী শক্তির সমাবেশ ঘটায়।যে শক্তি তাকে ধৈর্য ও ত্যাগ শিখায়। আল্লাহর সাথে অধিক নিকটবর্তীর সম্পর্কের কারণে সে যেমন নামাজে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যের মোহাব্বতে আটকে যায়, তেমনিও জেহাদের মাঠে, দুনিয়ার কোন পেরেশানি, কষ্ট, মানুষের ভৎসনা, বিপদ আপদ, সাংসারিক

সম্পর্কের জটিলতা সর্বপরি সব ধরনের সবর সংক্রান্ত বিষয়ে সবর করতে তার অন্তরে শক্তি যোগায়।

তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআনে সূরা বাকারার ১৫৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন-

"নামাজ ও সবরের মাধ্যমেই যাবতীয় সংকটের প্রতিকার হওয়ার কারণ এই যে, এ দু পন্থায়ই আল্লাহ তায়ালার প্রকৃত সান্নিধ্য লাভ হয়।

ان الله مع الصبرين

" নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারিগনের সঙ্গে আছেন "

বাক্যের দ্বারা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, নামাযী এবং সবরকারিগনের সাথে আল্লাহর সান্নিধ্য তথা খোদায়ী শক্তির সমাবেশ ঘটে। যেখানে বা যে অবস্থায় বান্দার সাথে আল্লাহর শক্তির সমাবেশ ঘটে গেছে, সেখানে দুনিয়ার কোন শক্তি কিংবা কোন সংকটই টিকতে পারে না, তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন করে না।বান্দা যখন আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হয়, তখন তার গতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে যায়। তার অগ্রগমন ব্যাহত করার মত শক্তি কারর থাকে না। বলাবাহুল্য, মকসুদ হাসিল করা এবং সংকট উত্তরণের নিশ্চিত উপায় একমাত্র আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হওয়ায় হতে পারে। "

উপরিউক্ত ব্যাখ্যা থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, মহান আল্লাহর সাথে নিকটবর্তী মোহাব্বতের সম্পর্ক শক্তিশালী না হওয়া পর্যন্ত, মহান আল্লাহকে না চেনা পর্যন্ত কেউ দুনিয়ার ধৈর্যসম্বলিত কার্যগুলো আল্লাহর পন্থায় সম্পান্ন করতে পারে না।কারণ, মানুষের মধ্যে আছে খারাপ নফস বা নফসে আম্মারা। এরা মানুষের মধ্যে চড়া হয়ে অবস্থান করে মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

কিন্তু ইসমে আজম বা আল্লাহর সাথে সান্নিধ্যের সম্পর্ক এই নফসে আম্মারাকে দুর্বল করে দেয়। ফলে দুনিয়ার বুকে কল্যান প্রতিষ্ঠায় এবং আল্লাহর ইচ্ছা আকাঙ্খা পুরুন

করার জন্য তারা ব্যাতিব্যস্ত হয়ে যায়। নিজের স্বার্থের কথা ভুলে যায়, সর্বদা কল্যানকামি চিন্তায় মগ্ন থাকে।

এই অবস্থায় মহান আল্লাহ যখন পৃথিবীতে কোন পরিবর্তন ঘটাতে চান তখন এই ধরনের বান্দাদের নির্বাচন করেন।

কারণ, তাদের ধৈর্য ও ত্যাগের মাধ্যমে অপারাপর মানুষগুলো শিক্ষা গ্রহণ করে। এবং একমাত্র তারাই মহান আল্লাহর ইশারা বুঝতে পারে। তাই আল্লাহর ইচ্ছা পূরণ করার জন্য নিজের জীবনের অনেক কিছু ত্যাগ করে।

যেমন, হুযুর পাক (সা:) যখন ইসলাম প্রচার করা শুরু করেছিলেন তখন তাহার আখলাক দেখেই প্রথম অবস্থায় সাহাবিরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

যেমন, আমরা সকলে একটা ঘটনা জানি- সেই সময়ে এক বুড়ি হুযুর পাক (সা:) এর যাওয়ার পথে কাটা বিছিয়ে রাখতেন। আমাদের প্রিয় নবী কোনদিন রাগ করেছিলেন? করেন নাই। অথচ বুড়ি যখন অসুস্থ হলো তখন তার বাড়িতে সেবা যত্নের জন্য চলে গেলেন। তা দেখে বুড়ি ইসলাম গ্রহণ করলেন।

অথচ, আপনি যদি আমাদের সমাজের এখনকার অধিকাংশ আলেমের যাওয়ার পথে যদি কাটা বিছিয়ে রাখেন তবে দেখবেন সে অতিশয় রেগে যাবে। তার ভিতরে এটা কখনও আসবেনা যে কাটা বিছিয়েছে তার প্রতি ভালোবাসা দেখানো।অথচ জোর গলায় বক্তৃতা দেয় আমরা নবীর অনুসারী, সাহাবাদের অনুসারী।প্রখ্যাত সাহাবী মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন -" কেয়ামত যখন নিকটবর্তী হবে তখন ভিক্ষুকের সংখ্যা বেশি হবে কিন্তু দাতার সংখ্যা কমে যাবে আর বক্তার সংখ্যা অধিক হবে কিন্তু জ্ঞানীর সংখ্যা কমে যাবে।"

আর ইসমে আজমের মহাত্ব হলো এটায়। কিভাবে ইসলাম বিজয় হবে তার জন্য সাধনা করা। শুধু তলোয়ার দিয়ে ইসলাম কায়েম হয়নি সাথে ধৈর্যের তলোয়ারও প্রয়োজন।

ইসলাম কায়েমের জন্য প্রকাশ্য জিহাদ যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন গোপন জিহাদ। এখনকার অধিকাংশ আলেমের মধ্যে একটি পাওয়া গেলেও আরেকটি নেই।

আর ইসমে আজম গোপন জিহাদে শক্তিশালী বানায়। এটাই ইসমে আজমের মহাত্ব।।

কিছু ঘটনাঃ (১) একবার আবু বকর (রা:) কে কাফেররা গালি দিচ্ছিল আর আবু বকর (রা:) জবাব না দিয়ে চুপ করে ছিলেন। তখন দূর থেকে রাসুল (সা:) এই দৃশ্য দেখে হাসতেছিলেন।কিন্তু এক পর্যায়ে তিনি ধৈর্য ধরতে না পেরে উত্তর দিয়ে দিলেন তখন আল্লাহর নবী(সা:) মন খারাপ করে ঘরে ফিরে গেলেন।

আবু বকর(রা:) তৎক্ষনিক প্রিয় নবীর কাছে গিয়ে তাহার চলে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন তখন প্রিয় নবী (সা:) বললেন -আমি যাহা দেখি তোমরা তাহা দেখনা।তুমি যখন কাফেরদের গালিতে চুপ করে ছিলে তখন মহান আল্লাহ একদল ফেরেস্তা পাঠিয়ে দিলেন, যারা জবাব দিচ্ছিল। কিন্তু তুমি যখন উত্তর দিয়ে দিলে তখন আল্লাহ তার ফেরেস্তাদের সরিয়ে নিলেন। তুমি যদি ধৈর্য ধারন করতে তাহলে এই নিয়ামত আরো পেতে।

এখন কথা হলো তখন যদি ধৈর্য ধারনের কারণে এভাবে মহান আল্লাহ তার ফেরেস্তা দিয়ে সাহায্য করান তাহলে এখনও কি আল্লাহ সেটা করান না?
তবে আমরা দেখি না।এটায় সত্য , কিন্তু এর ফায়দা অবশ্যই পাব। এগুলোও প্রিয় নবী (সা:) ও তার সাহাবাদের অনুস্মরণ।

আর সত্য এটায় ইসমে আজম ছাড়া এটা সম্ভব নয়।

(২) শায়ক ইসমাইল ফারগানী (রহ:) বলেন, দীর্ঘদিন যাবত আমার ইসমে আজম শিখিবার আকাঙ্খা ছিল। উহার জন্য আমি অনেক মোজাহাদা করিতাম এবং একাধারে কয়েকদিন না খাইয়া থাকিতাম।
আর এই না খাওয়ার দরুন বেহুশ হইয়া পড়িয়া যাইতাম।একদিন আমি দামেস্কের মসজিদে বসিয়াছিলাম।এমন সময় দুইজন লোক মসজিদে প্রবেশ করিল এবং আমার

নিকটে আসিয়া দাড়াইয়া গেলো।তাহাদিগকে দেখিয়া মনে হচ্ছিল এনারা মানুষ নয়, ফেরেস্তা। তাদের একজন অপারজনকে প্রশ্ন করিল তুমি কি 'ইসমে আজম' শিখিতে চাও? অপরজন বলিল জ্বি- হা, বলুন উহা কি? আমি তাহাদের কথা খুব মনোযোগ সহকারে শুনতে ছিলাম। অপরজন বলিলেন 'ইসমে আজম' হইল 'আল্লাহ' শব্দ তবে শর্ত হইলো উহা 'সিদকে লাজার' সহিত পড়িতে হইবে।

শায়খ ইসমাইল (রহঃ) বলেন, 'সিদকে লাজা' হইলো, 'আল্লাহ' শব্দ উচ্চারণকারীর অবস্থা তখন এমন হইবে যেমন, কোন ব্যাক্তি সাগরে ডুবিতেছে এবং তাহার উদ্ধারকারী কেহই নায়।এইরূপ অবস্থায় যেই আন্তরিকতার সহিত আল্লাহকে ডাকা হইতে পারে, সেই অবস্থা হইতে হইবে।

ইসমে আজম শিখার জন্য বড় যোগ্যতা ও কঠোর সংযমের প্রয়োজন।

তবে মোজাহাদার মাধ্যমে একবার অন্তরে যখন ইসমে আজম সেট হয়ে যায় তখন আর মুখে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলার প্রয়োজন হয় না। সে সব কিছুতেই মহান আল্লাহ তা'য়ালার উপস্থিতি অনুভব করে। সে যা কিছু করে আল্লাহর সামনেই করে।

সে যখন নামাজ পড়ে, আল্লাহর সামনেই নামাজ পড়ে,

সে যখন কোরআন তেলাওয়াতের করে, আল্লাহর সামনেই করে,

সে যখন দোয়া দূরুদ, তাসবিহ, তাহলিল পড়ে, আল্লাহর সামনেই করে,

সে যখন আখিরাতের কোন কাজ করে সেটাও যেমন আল্লাহর সামনেই করে আবার তেমনিও সে যখন দুনিয়ার প্রয়োজনে দুনিয়াবি কোন কাজ করে সেটাও মহান আল্লাহর সামনেই করে। যার কারণে তার প্রতিটি কাজে আল্লাহর ভয় থাকে এবং আল্লাহ যেভাবে চান সেভাবেই করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। নিজের স্বার্থের কথা ভুলে যায়। দিন রাত ২৪ ঘন্টায় তার প্রতিটি কাজে মহান আল্লাহর উপস্থিতি অনুভবে সে আল্লাহর সান্নিধ্যের অধিক নিকটবর্তী হয়ে যায়...

এটায় ইসমে আজমের বিশেষ মহাত্ম্য।

সর্বদা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আল্লাহর জিকিরের ধ্যান-ধারনাঃ

সর্বদা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আল্লাহর জিকিরের ধ্যান-ধারনা বড়ই কঠিন বিষয়। এটা সাধারণ শ্রেনির মানুষের জন্য বড়ই কষ্টসাধ্য ও সাধ্যাতীত।সব সময় অবিরামভাবে ধ্যান-ধারণা এবং অনুসন্ধান-অনুধ্যানের দুটি পদ্ধতি রয়েছে ।এ পদ্ধতি দুটিকে জিকিরে দায়েমী বলে। উপযুক্ত সময় নির্বাচন করে নিয়ম ও শৃঙ্খলামত ধ্যান-ধারণাদি কার্য সমাধা করা আবশ্যক। নিম্নে এবিষয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করা হলো:

প্রথম পদ্ধতি: দিন রাত ২৪ ঘন্টা কলবের সাথে শুধুমাত্র "আল্লাহ" "আল্লাহ" জিকির সহকারে কাটাতে হয়।শুধু মুখে বললেও চলবে না, শুধু মনে মনে বললেও চলবে না।কেননা,ক্বলবও একটি ইন্দ্রীয় বিশেষ।
রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন - "মানবদেহে একটি মাংস খন্ড আছে তা যদি পবিত্র হয় তাহলে গোটা দেহই পবিত্র হয়, আর তা যদি অপবিত্র হয় তাহলে গোটা দেহই অপবিত্র হয়, জেনে রেখো তা হল 'কল্বব'।"
-(সহিহ আল বুখারী)

তাই কল্বব বা অন্তর বললেও তা ইন্দ্রিয়ের কার্য বলে গন্য হবে। তাই সর্বদা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আল্লাহ তায়ালাকে অভ্যন্তরীণ জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা ধ্যান ধারণা করা আবশ্যক এবং অন্য প্রতিটি ইবাদতের সাথে সংযুক্ত রেখে আল্লাহর হুকুম পালন করা।যাহা নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত,তাসবিহ-তাহলিল, প্রয়োজনে জিহাদের মাঠে উপস্থিত হওয়া।সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকা। এক মুহূর্তও অন্য মনস্ক হওয়া উচিত নয়। তবে এ পদ্ধতি যেহেতু বেশ কষ্টসাধ্য এবং সাধারণের জন্য কঠিন সেহেতু অন্য আরেক পদ্ধতির মাধ্যমে সাধারণ শ্রেণির মানুষ উন্নতি লাভ করতে পারে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ পরিপূর্ণ সময় আখিরাতের জন্য ব্যায় করা যাদের পক্ষে সম্ভব নয় তারা সময়কে কয়েক ভাবে বিভক্ত করে কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করতে পারে। যারা মনকে সদা সর্বদা এক অবস্থায় রাখতে গিয়ে মনের স্বাভাবিক আনন্দ হারিয়ে ফেলে এবং নানা প্রকার মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে তারা সময়কে কয়েকভাবে বিভক্ত করে বিভিন্ন কার্যসম্পাদনের ব্যবস্থা করবে। কতকগুলি কার্য গোটা দেহ খাটিয়ে করবে যেমন, নামাজ ও জিহাদ।কতগুলি কার্য বাগন্দ্রিয়গুলিকে খাটিয়ে করবে, যেমন, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত, তাসবিহ তাহলিল আবার কতকগুলি কার্য কেবল মনের সাথে সম্পর্ক রাখে যেমন ধ্যান ও সদ্ভব চিন্তা 'তাফাক্কুর' 'تفكر '। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, বিভিন্ন দাওয়াতি জামাতে অংশগ্রহন করা, ইত্যাদি। এরূপে এক এক প্রকারের কার্যসমায় বিভাগের অনুকূল অংশে সমাপন করলে মন স্ফুর্তহারা হতে পারে না। সময়ের বিভিন্ন অংশে পৃথক পৃথক ধরনের কার্য অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলা করে নিলে আলাদা আলাদা সময়ে একটি কার্য সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়। অতএব মন এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে এক অভূতপূর্ব আরাম আনন্দ পেয়ে থাকে। এ প্রকারের ব্যবস্থায় আরও একটি ফল পাওয়া যায় তা হলো সাংসারিক আবশ্যকীয় কার্যে যে সময় টুকু ব্যায়িত হয় তাও আল্লাহ তায়ালার অভিপ্রায়ের অধীনে হয়ে যায়। কাজেই কোনভাবে অতিরিক্ত সময় নষ্ট হতে পারে না। এরূপ করতে পারলেও বিচারের দিনে পাপ পূণ্য ওজন করার সময় পুণ্যের পাল্লা অধিক ভারী হওয়ার আশা করা যায়। কিন্তু দুনিয়ার একমুহূর্ত কাল ভোগ বিলাসের ব্যয় করে অন্য সময় টুকু আখিরাতের কাজে ব্যয় করলে অর্থাৎ সমপরিমাণ সময় উভয় কাজে ব্যয় করলে পাপের পাল্লায় ভারী হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

কেননা, মানুষের নফস সবসময় পাপের কাজে বেশি আকৃষ্ট হয় ও আনন্দ পায় এবং পুন্যের কাজে কষ্ট ও ইচ্ছাশক্তি কম থাকে। ধর্মের কাজে অধিক মনোযোগ রাখা প্রবৃত্তির বিরোধী। অনেক সময় মানুষ ধর্মের কার্য গ্রহণ করলেও প্রবৃত্তির বিরোধিতার কারণে কিছু কিছু আমলের ক্ষেত্রে তাতে মনোযোগ থাকে না। ফলে আমল করেও কোন লাভ পায় না। তাই মনকে একনিষ্ঠ রাখার জন্য এ শ্রেণির মানুষের আল্লাহর জিকিরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা যাতে কোন না কোন পদ্ধতির আমল আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় ও গ্রহনযোগ্য হতে পারে। কবুল হতে পারে। এ কারণেই

অধিকাংশ সময় আখিরাতের কার্যে ব্যয় করে সামান্য সময় দুনিয়ায় কাজে ব্যয় করা প্রয়োজন।এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন -

" قم اليل الا قليلا .نصفه او انقص منه قليلا .اوزد عليه ورتل القران تر ترتيلا .انا سنلقى عليك قولا ثقيلا .ان ناسءة اليل هى اشد وطا واقوم قيلا .ان لك فى النهارسبحا طويلا .واذكراسم ربك وتبتل اليه تبتيلا.

" রাত্রিতে দন্ডায়মান হোন, কিছু অংশ বাদ দিয়ে। তার অর্ধেক অংশ -অথবা তার চাইতে আরো কিছু কম।কোরআন তেলাওয়াত কর ধীরে ধীরে, তারতীলের সাথে। আমি অচিরেই তোমার উপর গুরুত্বপূর্ণ বানী অর্পণ করছি।নিশ্চয়ই রাতে উঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক। দিনের বেলায় তোমার অনেক কর্মব্যস্ততা থাকে। তুমি তেমার রবের নাম স্মরণ করো এবং তাতে মগ্ন হয়ে যাও।"
(সূরা মুজাম্মিল-২-৮)

এখানে মহান আল্লাহ ত'য়ালা রাতের ইবাদতও বিভিন্নভাবে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।
নামাজ আদায় করা, ধীরে ধীরে তারতীলের সাথে পড়া, আল্লাহর নাম জিকির করা এবং তাতে মগ্ন হওয়া অর্থ মোরাকাবা অর্থাৎ ধ্যান করা।আমরা হুযুর পাক (সাঃ) এর জীবনীতে রাতের ইবাদতের ক্ষেত্রে এ সকল বিষয়গুলো দেখতে পায়।

হাদিসে এসেছে -" রাসুলুল্লাহ (সাঃ) একদিন রাতের নামাজের পর ধ্যানরত অবস্থায় মগ্ন ছিলেন, যেখানে দুনিয়ার কোন খেয়াল থাকে না। দীর্ঘসময় নড়াচড়া করতে না দেখে হযরত আয়েশা (রাঃ) তার পায়ের আঙ্গুলি চেপে ধরলেন, তখন তিনি বললেন, কে? হযরত আয়েশা বললেন, আমি আয়েশা। প্রিয় নবী (সাঃ) বললেন, আয়েশা কে? তিনি বললেন, আমি আবু বকরের কন্যা,তখন প্রিয় নবী (সাঃ) বললেন, আবু বকর কে?

তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বুঝতে পারলেন তার জাগতিক চেতনা নায়।"

এ প্রসঙ্গে আরোও এসেছে - মহান আল্লাহ বলেন-

"واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا."

অর্থ, " আর আপনার প্রভুর নাম সকাল সন্ধ্যায় যিকর করুন এবং রাত্রিকালে তার উদ্দেশ্যে সেজদা করুন এবং দীর্ঘ রাত্রি ব্যাপিয়া তার তাসবিহ পাঠ করুন। "-সূরা দাহর: রুকু ২

তিনি আরোও বলেন -" كانوا قليلا مناالليل ما يهجعون

অর্থ, " রাতের বেলা তারা অতি সামান্য সময় ঘুমিয়ে থাকে।"

আল্লাহ তা'আলার এ বানী থেকে বুঝা যায় যে, অধিকাংশ সময় আল্লাহর স্মরণে কাটানো আবশ্যক। দিবা ও রাত্রিকালের সময় বিচারপূর্বক ভাগ করে না নিলে শৃঙ্খলার সাথে কাজ করা কঠিন। আর নফলের ক্ষেত্রে কোন ধারাবাধা নিয়ম নাই। বান্দা যখনই তার দুনিয়বি প্রয়োজনের কাজকর্ম থেকে অবসর নিবে তখনই নফল নামাজ(হারাম সময় ব্যতিত), কোরআন তেলাওয়াতের, তাসবিহ, তাহলিল ও যিকির করতে পারবে। তাছাড়া মৌখিক যিকির সে সদাসর্বদা কাজকর্মের মধ্যেও করতে পারবে যদি সে উর্ধ পর্যায়ের মুজাহাদাকারী হয়।এটা তার জীবনের চরম সাফল্য এনে দিবে ইনশাআল্লাহ।

তবে সময়কে ভাগ করে প্রত্যেকের সুবিধা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময় নির্বাচন করে নিতে হবে সকাল সন্ধ্যায়।যাতে করে সে নিজকে অভ্যস্ত করতে পারে আমলে।কারণ, সেই সময় আসলেই তার মনে পড়ে যাবে,অন্য কাজ তার ভালো লাহবে না, শয়তানের ধোকা তাকে ক্ষতি গ্রস্ত করতে পারবে না।তাই সুবিধা অনুযায়ী প্রত্যেকে একটি নির্দিষ্ট সময় নির্বাচন করা সকাল সন্ধ্যায় মহান আল্লাহর যিকির, তাসবিহ, তাহলিল ও মোরাকাবা (আল্লাহর ধ্যান) করার জন্য।

মহিমান্বিত যিকিরঃ

আল্লাহপাকের জিকির ও স্মরণের অসংখ্য পথ ও পদ্ধতি রয়েছে। এর যে কোনো একটি অবলম্বন করলেই জিকির সম্পন্ন হয়ে যায়। তবে, সবচেয়ে উত্তম জিকির হলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াদাহু লা শারীকা লাহু'।

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য মা'বুদ বা উপাস্য নেই, তিনি একক তার কোনো অংশী নেই। এই জিকিরের মধ্যে তাওহীদের স্বীকৃতি যেমন মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে, তেমনি অংশীবাদিতার যাবতীয় উপায় উপকরণকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। নবী করিম সা. স্পষ্টতই বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম দোয়া হলো আরাফাত দিবসের দোয়া। আর সবচেয়ে উত্তম কথা হলো যা আমি এবং অতীতের নবীগণ বলেছেন। আর তা হলো: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আ'লা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর।' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য মা'বুদ বা উপাস্য নেই। তিনি একক অদ্বিতীয়। তার কোনো শরীক নেই। সকর রাজত্ব কেবলমাত্র তারই জন্য। আর প্রশংসাও একমাত্র তারই। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

মহান রাব্বুল আলামীন স্বীয় ঈমানদার বান্দাহগণকে অধিক হারে তার জিকির করার এবং সকাল সন্ধ্যায় তার তাসবীহ বা প্রশংসা করার তাকীদ করেছেন। আল কোরআনে ইরশাদ হয়েছে : ওহে যারা ঈমান এনেছ; তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি করে জিকির (স্মরণ) কর। আর সকাল-সন্ধ্যা তার তাসবীহ (প্রশংসা) কর। (সূরা আহযাব : ৪১-৪২)।

এ ছাড়া আল্লাহপাকের জিকিরের জন্য তিনি নামাজ কায়েম করার ব্যবস্থাও করেছেন। আল কোরআনে ইরশাদ হয়েছে : তোমরা আমার জিকিরের জন্য নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর। (সূরা ত্বাহা : ১৫৪)।

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, ঈদুল আযহার পরবর্তী তিনদিনে আইয়্যামে তাশরীক বলা হয়। এই দিনগুলোকে আল্লাহপাক ঈমানদার বান্দাহদের জন্য পানাহার করা ও জিকির করার

জন্য নির্ধারণ করেছেন। নবী করিম সা. বলেছেন : তাশরীকের দিনগুলো হচ্ছে পানাহার এবং আল্লাহর জিকিরের জন্য।

মোট কথা, আল্লাহপাক আমাদেরকে তার জিকির করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি জিকিরকারী বান্দাহদের প্রশংসা করেছেন এবং তাদের জন্য পুরস্কারের অঙ্গীকার করেছেন। বিভিন্ন ইবাদত আদায় করার পর মুমিন বান্দাহগণকে তিনি জিকির করার আদেশ করেছেন। আল কোরআনে ইরশাদ হয়েছে : তোমরা যখন নামাজ কায়েম করা সম্পন্ন করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহর জিকির করবে। (সূরা আন নিসা : ১০৩)।

বিশেষত হজ পালনের সময় আল্লাহর জিকির করার তাকিদ করা হয়েছে। আল কোরআনে ইরশাদ হয়েছে : যখন আরাফাত থেকে তোমরা ফিরে আসবে তখন (মুজদালিফায়) মাসায়ারে হারামের নিকট আল্লাহর জিকির করবে। (সূরা বাকারাহ : ১৯৮)।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা আরও ঘোষণা করেছেন : আর তারা (মুমিনগণ যেন নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহপাক তাদেরকে চতুস্পদ জন্তুর মধ্য থেকে যে সকল রিজিক প্রদান করেছেন, এর জন্য আল্লাহর নাম স্মরণ করে। (সূরা বাকারাহ : ২০৩)।

পরিশেষে, এ কথা স্পষ্টতই বলা যায় যে, মানবজীবনে ঈমানদার বান্দাহগণের উচিত সকল সময়ে আল্লাহপাকের জিকিরে নিমগ্ন থাকা। কেননা, যারা আল্লাহর জিকিরের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাদের দুনিয়ার জীবন হয় অভাব-অনটনে পরিপূর্ণ এবং পরকালে হাসরের ময়দানে তারা অন্ধ হয়ে উত্থিত হবে। এমনটা কারও কাম্য হতে পারে না।

যিকিরে খফির উপকারিতাঃ

খফি অর্থ 'গোপন'। নিরবে, নিভৃতে, নিরবচ্ছিন্ন মহান আল্লাহকে স্মরণ করাকে যিকিরে খফি বলে। যে যিকিরে কোন শব্দ হবে না, ঠোঁট নড়বে না, শরীর দুলবে না, পাশে কেউ বুঝতেও পারবে না যে, আল্লাহর যিকিরে রত আছে। আল্লাহ 'মনিব' আর আমরা 'গোলাম'। গোলাম তার মনিবকে ডাকবে নিরবে নিভৃতে। পাশের কেউ জানতেও পারবে না।এটাই যিকিরে খফির মহাত্ম্য।পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে আয়াত এসেছে -

".ادعوا ربكم تضرعا و خفية، انه لايحب المعتدين "

অর্থ, " তোমরা বিনয়ের সহিত এবং চুপে চুপে তেমার রবকে ডাকিতে থাক।নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।- (সূরা আ'রাফ- রুকু-৭)

আরো বলা হয়েছে -

"واذكر ربك فى نفسك،تضرعا وخيفة ودون الجلمر من القول بالغدو والاصال ولا تكن
".من الغفلين

অর্থ -" আপন রবকে স্মরণ করিতে থাক নিজ অন্তরে কিছুটা নিম্ন আওয়াজে এবং বিনয় ও ভয়ের সহিত সর্বদা সকাল ও সন্ধ্যায়, আর গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"- (সূরা আ'রাফ- রুকু-৪২)

আয়েশা (রাযি:) হইতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করা হইয়াছে যে, "যিকিরে খফি অর্থাৎ গোপন যিকির যাহা ফেরেশতারাও শুনতে পায় না, উহার সাওয়াব সত্তর গুণ বেশি। কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তাআলা সমস্ত মাখলুককে হিসাবের জন্য জমা করিবেন এবং কিরামান কাতেবিন আমলনামা লইয়া হাজির হইবে, তখন আল্লাহতা'লা বলিবেন, অমুক বান্দার আমলসমূহ দেখো, কোন কিছু বাকি রহিয়াছে কিনা, তাহারা আরজ করিবেন, আমরা সবকিছু লিখিয়াছি এবং

হেফাজত করিয়াছি, আল্লাহ তায়ালা বলিবেন আমার নিকট তাহার এমন নেকি রহিয়াছে যাহা তোমাদের জানা নাই, উহা হইল, যিকিরে খফি।"

কত ভাগ্যবান ওই সমস্ত লোক যাহারা এক মুহূর্তও যিকির হইতে গাফেল হয় না তাহারা জাহেরী (নামাজ, রেজা, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ) এবাদাতের সওয়াব তো পাবেনই আবার সর্বক্ষণ জিকির ফিকিরের কারণে তাহারা ৭০গুণ বেশি সাওয়াব পায়বেন।মুসনাদে আহমদ(আবু ইয়ালা)

জিকির কোন দলের আমল নয়ঃ

মৌখিকভাবে সদাসর্বদা আল্লাহ নামের যিকির করা কোন দলের হতে পারে না। প্রতিটি মানুষের ক্বলবকে পরিশুদ্ধি করার জন্য এবং নফসের যাবতীয় খারাপ বিষয়গুলো দূর করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছানোর জন্য যিকিরের আধিক্য অপরিসীম। আমাদের সমাজে দেখা যায় কোন দল যদি আল্লাহর যিকির বেশি করে তখন মনে করা হয় যিকির ঐ দলের আমল আমাদের নয় আবার যারা বেশি বেশি জিহাদের কথা বলে তখন মনে করা হয় জিহাদ ঐ দলের কাজ আমাদের দলের কাজ নয় আবার কেউ যদি বিভিন্ন দেশ- বিদেশে তাবলিগের কাজ করে তখন মনে করা হয় তাবলিগ শুধু তাহাদের কাজ আমাদের নয়। তবে এগুলো সবচেয়ে আমাদের বেশি ক্ষতি গ্রস্ত করেছে। কারণ, প্রতিটি আমল মহান আল্লাহর হুকুম, এখানে কোন দলের তৈরী করা কোন বিষয় নেই, অথচ আমরা এক এক দলে এক একটি বিষয়েকে প্রভাবিত করে সেই দলকে শক্তিশালী করার জন্য অন্য বিষয়ের গুরুত্ব দেয় না বরং অন্য দলের বিষয়গুলো নিয়ে বিরোধিতা করার জন্য বিভিন্ন মাসআলা- মাসায়েল খুজতে থাকে। যাতে তাদের দলে লোকজন বেশি আসে এবং অন্য দলকে ভ্রান্ত মনে করে।

এখনে মনে রাখা উচিৎ আমল কখনও কারর দলের হয় না, এগুলো মহান আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহর কিছু নির্দেশ মানব আর কিছু নির্দেশের বিরোধিতা করব এর কোন সুযোগ ইসলামে নেই । আমল সবার জন্য সমান। তাই যিকিরও কোন দলের নয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

قل ادعوا الله اوادعواالرحمن.ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى"

" আপনি বলিয়া দিন, তোমরা আমাকে 'আল্লাহ' বলিয়া ডাক অথবা 'রহমান' বলিয়া ডাক: যেই নামেই ডাকিবে (উহাই উত্তম (কেননা,তাহার বহু ভাল ভাল নাম রহিয়াছে। "-(সূরা ইসরা-রুকু-১২)

তিনি আরোও বলেন-

فاذا قضيتم الصلوة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم"

"যখন তোমরা নামাজ পড়িয়া নিয়াছ,এখন তোমরা আল্লাহর যিকিরে মশগুল হইয়া যাও।দাড়াইয়াও আল্লাহর যিকির কর,বসিয়া যিকির কর এবং শুইয়াও যিকির কর।(মোটকথা কোন অবস্থাতে আল্লাহর স্মরণ ও তাহার যিকির হইতে গাফেল হইও না।" - সূরা নিসা (রুকু-১৫)

উপরোক্ত আয়াত থেকে আমরা এ ধারণা করতে পারি যে, যিকির কোন দলের নয়। যে, যে দলের হোকনা কেন যিকির তাকে সম্মানিত স্থানে পৌছায়ে দিবে ইনশাআল্লাহ।

যিকির নিয়ে ভন্ডামিঃ

আমাদের সমাজে কিছু কিছু জায়গায় দেখবেন যিকির নিয়ে বড় ভণ্ডামি চলছে। বিভিন্ন ভন্ড পীরের দরবারে এবং বিভিন্ন পীরের মাজারে দেখা যায় ভন্ড পীরের আড্ডাখানা। এখানে সাধারণত অর্থলোভী ভন্ডরা পীরের হালতে বসে থাকে ধন সম্পদে আত্মসাতের নিয়তে।অনেক সময় দেখা যায় এরা নারী পুরুষ একসাথে যিকির করে। যেটা ইসলামে হারাম। এ সকাল জায়গা থেকে আমরা দূরে থাকব, শুধু তাই না এর বিরোধিতা করব এবং জনগনকে সচেতন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

একটা কথা মনে রাখা উচিৎ, সেটা হলো, ভন্ডরা যখন ভন্ডামি করে তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ভালো জিনিস নিয়েই ভন্ডামি করে। তাই বলে আমি ভালো জিনিসটা কেন ছেড়ে দিব? খেয়াল করেন,- কেউ যদি নামাজ লোক দেখানোর জন্য পড়ে, সে করিরা গুনাহ করে তাই বলে কি আমিও নামাজ ছেড়ে দিব? কখনও না। আবার দেখেন সমাজে মহিরারা চুরি করে বোরকা পরে, তাই বলে কি আমি বোরকা পড়া ছেড়ে দিব? কখনও না। এজন্য সমাজে ভন্ডরা 'আল্লাহ' নামের যিকির করছে বলে আমি যিকির ছেড়ে দিব না।আমি আল্লাহ তা'য়ালার সান্নিধ্যে পৌছানোর জন্য, গোনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, নিজেকে পবিত্র করার জন্য, আসমান জমিনের রহস্য বোঝার জন্য মহান আল্লাহর যিকিরে রত থাকার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

বাইয়াতঃ

বাইয়াত (আরবি- بَيْعُةٌ) শব্দটি একটি ইসলামিক পরিভাষা । এর অর্থ আনুগত্যের চুক্তি, আনুগত্যের শপথ ও আনুষ্ঠানিক আনুগত্য (সূত্র: আল মুজামুল ওয়াফী) । এর মূলধাতু হলো (بيع) যার অর্থ বিক্রয় করা, লেনদেন করা, শপথ করা, চুক্তি করা ইত্যাদী । তবে, ইসলাম ধর্মে বাইয়াত বলতে শপথ পাঠ বা আনুগত্যের চুক্তিকে বুঝানো হয়।

বাইয়াতের প্রকারভেদঃ

কোরআনের আয়াত ও হাদীস পর্যালোচনা করলে অন্তত পাঁচ ধরনের বাইয়াতের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ১. খিলাফাতের বাইয়াত। যা ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্বের প্রতীক হিসেবে নেয়া হয়ে থাকে। ২. বাইয়াতে ইসলাম। তথা ইসলাম গ্রহণের জন্য বাইয়াত নেয়া। ৩. তাকওয়া পরহেযগারীতে অগ্রগামী হবার শপথের বাইয়াত। যাকে বাইয়াতে তাসাওউফও বলা হয়। ৪. বাইয়াতে জিহাদ ও হিজরত। জিহাদ বা কাফেরদের জুলুমী রাষ্ট্র ছেড়ে দেয়ার বাইয়াত। ৫. জিহাদের ময়দানে দৃঢ় থাকার বাইয়াত। যদি কখনো জিহাদের ময়দানে ভয়ে পালিয়ে যাবার শংকা দেখা দেয়, তখন আমীরে জিহাদের হাতে দৃঢ়তার বাইয়াত গ্রহণ করা। 'আল কাওলুল জামীল' এ শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী বলেন, فالحق ان البيعة على اقسام، منها بيعة الخلافة، ومنها

بيعة الاسلام، ومنها بيعة التمسك بحبل التقوى، ومنها بيعة الهجرة والجهاد، ومنها بيعة التوثق فى الجهاد،( ) আরবি শব্দের মূল অর্থ বিক্রয় বটে, কিন্তু এর গৌণ অর্থ হলো চুক্তি,শপথ, অংগীকার। বেচা-কেনার ব্যাপারে ক্রেতার ও বিক্রেতার মধ্যে যেসব শর্ত ঠিক করা হয় তা মেনে নেয়ার চুক্তির ভিত্তিতেই লেন-দেন হয়ে থাকে। এভাবেই বাইয়াত শব্দটি চুক্তি,শপথ,অঙ্গীকার শ্রদ্ধা প্রদর্শন আনুগত্য স্বীকার ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করা হয়। আরবি শব্দের ক্রিয়া-বাচক শব্দ হলো আরবি এর অর্থ শুধু বিক্রয় শব্দেই সীমাবদ্ধ নয়। এর অর্থ হয় চুক্তি করা, সম্মান প্রদর্শন করা, নেতৃত্ব মেনে নেয়া, আনুগত্যের শপথ করা, বিক্রয়ের জন্য পেশ করা, চুক্তি চূড়ান্ত করা এবং ব্যবসায় লেন-দেন করা ইত্যাদি। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যে বাইয়াত ছিল তা হলো বাইয়াতে রাসূল। খিলাফাতের যুগে ছিল বাইয়াতে খিলাফাহ।

খিলাফাতের পর যে বাইয়াতের প্রচলন শুরু হয় তা হলো বাইয়াতে তাকওয়াহ। তাকওয়া অর্জনের জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে এ ধরনের বাইয়াত করিয়েছেন।

পীরের প্রয়োজনীয়তা কি? ইসলামে তাসাউফ তথা শরীয়তের পাশাপাশি তরীকত হাকীকত ও মারেফাত অর্জন এবং সে জন্য পীর-মুর্শিদের কাছে বাইয়া’ত গ্রহণ একটি অত্যাবশকীয় বিষয় যা কোরআন হাদীছ ইজমা ও ক্বিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত। এ প্রসঙ্গে কোরআনুল কারীমে আল্লাহ পাক বলেনঃ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ মু’মিনদের প্রতি আল্লাহ পাকের বড়ই ইহসান যে তাদের মধ্যে হতে তাদের জন্য একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, তিনি আল্লাহ পাকের আয়াতগুলো তেলায়াত করে শুনাবেন, তাদেরকে তাযকিয়া (পরিশুদ্ধ) করবেন এবং কিতাব ও হিকমত (আধ্যাত্মিক) জ্ঞান শিক্ষা দিবেন। যদিও তারা পূর্বে হেদায়েত প্রাপ্ত ছিল না। (সূরা আল এমরান, আয়াত-১৬৪) আল্লাহপাক তাঁর কালাম পাকে এরশাদ করেনঃ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ “আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি জীবন বিধান বা শরীয়ত, অপরটি তরীকত-সম্পর্কিত বিশেষ পথ নির্ধারণ করে দিয়েছি। (সূরা মাইয়িদা, আয়াত ৪৮) আল্লাহ পাক তাঁর কালাম পাকে আরও এরশাদ করেন: وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا “ তারা যদি তরীকতে (সঠিক পথে) কায়েম থাকতো তাহলে আমি তাদেরকে সুমিষ্ট পানীয় দিতাম। (সূরা জ্বীন, আয়াত-১৬) মহান আল্লাহ পাক তাঁর

পবিত্র কালামে এরশাদ করেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আর সাদেকীনদের সঙ্গী হও"। (সূরা তওবা, আয়াত-১১৯) এ আয়াত পাকে আল্লাহ পাক মূলতঃ পীর-মাশায়েখগণের সঙ্গী বা সোহবত এখতিয়ার করার কথা বলেছেন। কারণ হক্কানী মুর্শিদগণ-ই হাকীকি ছাদেকীন। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা কোরআন শরীফের প্রথম সূরাতেই শিখিয়ে দিচ্ছেন اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ "আমাদের সরল সঠিক পথে [সীরাতে মুস্তাকিমে] পরিচালিত করো। তাঁদের পথ যাঁদেরকে তুমি নিয়া'মত দান করেছো।" (সূরা ফাতিহা, ৬-৭) সূরায়ে ফাতিহায় মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দারা যে পথে চলেছেন, সেটাকে সাব্যস্ত করেছেন সীরাতে মুস্তাকিম। আর তাঁর নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দারা হলেনঃ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا "যাদের ওপর আল্লাহ তা'আলা নিয়ামত দিয়েছেন, তাঁরা হলেন নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও নেককার বান্দাগণ।" (সূরা নিসা, ৬৯) এ দু'আয়াত একথাই প্রমাণ করছে যে, নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দা হলেন নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ, আর নেককারগণ তথা আল্লাহ'র অলীগণ। যাঁদের শানে আল্লাহ্ নিজেই ঘোষণা দেন, أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ "সাবধান! নিশ্চয়ই আল্লাহ'র অলী বা বন্ধুগণের কোনো ভয় নেই এবং তাঁদের কোনো চিন্তা-পেরেশানী নেই।" (সূরা ইউনূস, ৬২) আর ওই সকল প্রিয় বান্দাদের পথ-ই সরল সঠিক তথা সীরাতে মুস্তাকিম। অর্থাৎ, তাঁদের অনুসরণ করলেই সীরাতে মুস্তাকিমের ওপর চলা হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক তাঁর পাক কালামে আরো এরশাদ করেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহপাককে ভয় করো, আর তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য উছিলা গ্রহণ করো। (সুরা মায়েদা, আয়াত-৩৫)

যাহেরী আমল তথা দেহের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত আমল ও তার মাসআলা-মাসাঈল শিক্ষা করার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, এটিই নিয়ম। উস্তাদ ছাড়া এসব কাজ সঠিকভাবে আদায় হয় না। কিন্তু বাতেনী আমলের ফরয, ওয়াজিব, হারাম, মাকরূহ- যেগুলো তাসাউফ ও ত্বরীকতের মধ্যে বর্ণনা করা হয়, সেগুলোর ইলম হাসিল করা এবং সে অনুপাতে আমল করার জন্য উস্তাদের প্রয়োজন তার চেয়েও অধিক। এ সমস্ত বিষয়ের উস্তাদকে পরিভাষায় শাইখ, মুরশীদ বা পীর বলা হয়।

আধ্যাত্মিক ব্যাধি ও মন্দ চরিত্রসমূহ বোঝা এবং সেগুলোর চিকিৎসা ও সংশোধন করা সাধারণতঃ পীর বা মুরশীদ ছাড়া সম্ভব নয়। তাই যে ব্যক্তি এ পথে পা রাখবে, তার জন্য মুরশীদের সন্ধান করা জরুরী। সন্ধান করে এ ধরণের পীর পেলে, তাঁর শরণাপন্ন হবে এবং পরিপূর্ণরূপে তাঁর শিক্ষা ও নির্দেশনা মেনে চলবে। কেউ যখন পীরের শিক্ষা বা ছবকানুযায়ী আমল করতে আরম্ভ করবে, তখন সে নিজেই বুঝতে পারবে যে, নিজের যাহেরী ও বাতেনী আমল সহীহ করতে জায়গায় জায়গায় পীর ও মুরশীদের প্রয়োজন পড়ে। একজন কামিল পীরের পথপ্রদর্শন ছাড়া তওবা ইত্যাদি পরিপূর্ণ হওয়া জটিল ব্যাপার।

তাই পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, বাইয়াতের যে ৫ টি ধাপ বর্ননা করা হয়েছে প্রত্যেকটির গুরুত্ব অপরিসীম। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেকটির উপরে আমাদের বাইয়াত নেয়া প্রয়োজন। নফসের পবিত্রতার জন্য, গোনাহমুক্ত হয়ে জিন্দিগি পার করে মহান প্রভুর দরবারে হাজিরা দেওয়ার জন্য যে যে বিষয়ে আমাদের বাইয়াত নেওয়া প্রয়োজন সে সব বিষয়ে বাইয়াত নিয়ে কাজ করা।

জিকিরের ক্ষেত্রে রিয়া বিষয়ে আলোচনাঃ

যেহেতু আমরা ফরজ আমল ও অন্যান্য আমল একটি নির্দিষ্ট সময় করে থাকি ফলে বৃহৎ সময় পার হয়ে যায় দুনিয়ার পেরেশানিতে। কারণ, মানবের অন্তর কখনও খালি থাকে না। কোন না কোন চিন্তা ভাবনা অথবা কোন বিষয়ের মধ্যে ডুবে থাকে, এটাই চিরাচরিত নিয়ম।আর শয়তান মানুষের এই বৃহৎ সময়কে কাজে লাগায়। তাই এই বৃহৎ সময় যদি মহান আল্লাহর সান্নিধ্যের বিশেষ মাধ্যম মনে করে বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করি এবং সদাসর্বদা জিকিরে ও ফিকিরে অভ্যস্থ হতে পারি তাহলে শয়তানের দ্বারা পদস্খলিত হওয়ার কোন সুযোগ থাকে না। আর এটা করতে হলে অবশ্যই নির্দিষ্ট একটি নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ হতে নয় অথবা এ বিষয়ের উপর কোন উস্তাদের কাছে আমলে আবদ্ধ হতে হয়।বিশেষ কিছু অর্জন করতে হলে বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করতে অবশ্যই অনেক ধৈর্য ও পরিশ্রম ও মোজাহাদার প্রয়োজন, যেটা একা একা বেশ কিছু দিন যায় তারপর সম্ভব হয় না, মনোজগতে নফসের প্রেসার আসে, অন্তরের স্বাভাবিক

আনন্দ হারিয়ে বিভিন্ন দিকে ছোটাছুটি করে। এজন্য নিজেকে পবিত্রের জন্য এই বিষয়ের উপর অটল থাকার জন্য কোন একজন উস্তাদ এবং কোন একটা মজলিসে নিজেকে পাবন্দি করা। এবং দিন রাত অধিক পরিমানে আল্লাহর জিকির ফিকিরে রত হওয়া।

এখন প্রশ্ন হলো এত অধিক পরিমানে সর্বদা জিকিরে ফিকিরে রত থাকলে অন্যরা রিয়াকার ভাববে কিনা?

প্রথমে জানা দরকার রিয়া কাকে বলে?

রিয়া হলো মানুষকে দেখানো বা শুনানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত করা।

রিয়া বা লোক দেখানো 'ইবাদাত তিন প্রকার। যথা:-

(১) কোন নেক কাজ ('ইবাদাত) মূলত: শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র গায়রুল্লাহ্‌কে (আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাউকে) দেখানোর উদ্দেশ্যে বা মানুষের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে করা, এবং বাহ্যিকভাবে লোকজন যেন তার কাজটা দেখে আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত বলেই মনে করে, এমন মনোভাব পোষণ করা।

যদিও এতে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে অংশীদার বা সমান করা উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে তথাপি এ জাতীয় 'ইবাদাত হলো শিরকের (শিরকে আসগারের) অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের 'ইবাদাত আল্লাহ্‌র নিকট আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কোন মু'মিন ব্যক্তি এরূপ 'ইবাদাত করতে পারে না।

(২) কোন 'ইবাদাত মূলত: একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই শুরু করা, তবে 'ইবাদাত করাকালীন বা চলাকালীন মধ্যবর্তী সময়ে অন্য কেউ তা দেখে ফেললে বা অবহিত হয়ে গেলে তাতে আনন্দিত ও উল্লাসিত হয়ে লোক দেখানোর জন্য 'ইবাদাতকে আরো সুন্দর করার চেষ্টা করা কিংবা পরবর্তী অংশটুকু লোক দেখানোর

উদ্দেশ্যে করা। এ অবস্থায় ‘আমাল বা ‘ইবাদাতটি যদি এমন হয় যে, তার এক অংশ অপর অংশের উপর নির্ভরশীল নয় বরং তার প্রতিটি অংশ পৃথক পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাহলে সেই ‘আমাল বা ‘ইবাদাতের যে অংশটুকু রিয়া মিশ্রিত হবে, শুধুমাত্র সে অংশটুকু বাত্বিল হয়ে যাবে, তবে তার সম্পূর্ণ ‘আমাল বাত্বিল হবে না। যেমন- কোন ব্যক্তি একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে দু‘শত টাকা ফক্বীর-মিছকীনদের দান করতে শুরু করল, ইতোমধ্যে একশত টাকা দান করার পর হঠাৎ করে সে দেখল যে, অনেক লোক তার দিকে চেয়ে আছে, তাকে বাহবা দিচ্ছে এবং তার প্রশংসা করছে, এতে করে তার মনের মধ্যে রিয়া বা লৌকিকতার ইচ্ছা দেখা দিল এবং অবশিষ্ট একশত টাকা সে মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে কিংবা আরো বেশি করে তাদের বাহবা ও প্রশংসা কুড়ানোর উদ্দেশ্যে দান করল। এমতাবস্থায় তার দানকৃত প্রথম একশত টাকা আল্লাহ্‌র নিকট মাক্ববূল (গৃহীত) হবে এবং পরবর্তীতে দানকৃত একশত টাকা আল্লাহ্‌র (0) নিকট বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত বলে গণ্য হবে।

আর যদি ‘আমালটি এরকম না হয় বরং তার প্রথম অংশ শেষ অংশের উপর বা এক অংশ অপর অংশের উপর নির্ভরশীল হয় অর্থাৎ ‘আমালের এক অংশ অপর অংশের সাথে এমনভাবে জড়িত হয়ে থাকে যে, এর প্রতিটি অংশ একটি অপরটি ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করতে পারে না, তাহলে এর দুই অবস্থা-

(ক) ‘আমাল বা ‘ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ্‌র (0) সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে শুরু করার পর ‘ইবাদাত করাকালীন মধ্যবর্তী সময়ে যদি লোক দেখানোর (রিয়া’র) ইচ্ছা মনের মধ্যে দেখা দেয় এবং এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি যদি লৌকিকতার এ মনোভাব তার অন্তর থেকে দূর করার এবং ‘আমালকে রিয়ামুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রেখে ‘আমাল সম্পন্ন করে, তাহলে তার সেই ‘আমাল বা ‘ইবাদাত বাত্বিল হবে না।

উদাহরণ স্বরূপ যেমন- কোন ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে নামায পড়তে শুরু করল। এমতাবস্থায় নামাযের দ্বিতীয় রাক‘আতে তার অন্তরে রিয়া‘র উদ্রেক হলো। সাথে সাথে সে তার অন্তর থেকে এই কুমন্ত্রণা ও কুমনোভাব দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যেয়ে নামায সম্পন্ন করল, তাহলে এই

রিয়া তার ‘আমালে কোন প্রভাব ফেলবে না এবং আল্লাহ চাহেতো তার এই নামায বাত্বিল হবে না।

(খ) যদি সে ব্যক্তি তার অন্তরের এই কুমন্ত্রণা দূর করার এবং ‘আমালকে রিয়ামুক্ত করার চেষ্টা না করে, বরং রিয়া তথা লোক দেখানোর উদ্দেশ্য অন্তরে পোষণ করেই ‘আমাল সম্পন্ন করে থাকে, তাহলে তার এই ‘আমাল সম্পূর্ণ বাত্বিল ও বিনষ্ট হয়ে যাবে।

এ সম্পর্কে রাছূল 1 বলেছেন:-

৩.مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ

অর্থ:- যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ল সে শির্ক করল, যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে রোযা পালন করল সে শির্ক করল, যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে দান-সাদাক্বাহ করল সে শির্ক করল।

৩। আল্লাহ্‌র জন্যে পূর্ণ নিষ্ঠা ও ইখলাসের সাথে কোন ‘আমাল আরম্ভ ও সম্পন্ন করা। তবে ‘আমাল সম্পন্ন হওয়ার পর অন্তরে রিয়া‘র উদ্ভব হওয়া। যেমন- লোকজনের মুখে এ ‘আমাল সম্পর্কে নিজের প্রশংসা শুনে নীরবে আত্মতৃপ্তি ও গর্ববোধ করা। এ জাতীয় রিয়া, সম্পাদিত সেই ‘আমাল ও ‘ইবাদাতে কোনরূপ প্রভাব ফেলে না এবং এর দ্বারা ‘ইবাদাত বাত্বিল বা বিনষ্ট হয় না। কেননা তা ‘ইবাদাত সম্পন্ন তথা সমাপ্ত হওয়ার পর প্রকাশ পেয়েছে।

১. رواه مسلم
২. সাহীহ্ মুছলিম
৩. رواه أحمد
৪. মুছনাদে ইমাম আহ্মাদ

এবার আসল কথায় আসি, রিয়া যেহেতু অন্তরের বিষয় এটা নির্ধারন করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কে লোক দেখানোর জন্য জিকির করছে আর কে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছানোর জন্য যিকির করছে এটা বোঝার ক্ষমতা কারর নাই। যদিও সে রিয়াকারী হোক বা নাহোক। যদি সে সত্যই রিয়াকারী না হয়ে থাকে তাহলে ধারণাকারী জাহান্নামী।

হাদিসে এসেছে, হুযুর পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন- " আল্লাহর যিকির এতবেশি করতে থাক যে লোকেরা পাগল বলে।"-(তারগীব: আহমদ, ইবনে হিব্বান,হাকিম)

উক্ত হাদিসে আরো বলা হয়েছে যে, এমনভাবে যিকির করিতে থাক যে, মোনাফেকরা তোমাকে রিয়াকার বলে।-(তারগীব: তারাবানী)

এই হাদিস দ্বারা এটায় বুঝা যায় যে, মোনাফেক বা অজ্ঞলোকদের রিয়াকার বা পাগল বলার কারণে যিকিরের মত এত বড় দৌলত ছাড়িয়া দেওয়া চাই না; বরং অন্তর সমস্ত খারাপ চিন্তা থেকে মুক্ত রেখে বেশি পরিমানে ও গুরুত্ব সহকারে যিকির করা।

ইবনে কাসীর (রহ:) হযরত ইবনে আব্বাস (রাজি:) হইতে বর্ননা করিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার উপর যে কোন জিনিস ফরজ করিয়াছেন উহার একটা সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়েছেন এবং ওজর হইলে গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু জিকিরের জন্য কোন সীমা নির্ধারণ করেন নাই। আবার জ্ঞান-বুদ্ধি থাকা অবস্থায় ইহার জন্য কোন ওজর আপত্তি ও গ্রহণ করেন নাই। যেমন কোরআন পাকে এরশাদ হয়েছে-

اذكرو الله ذكرا كثيرا

অর্থাৎ, " আল্লাহ পাকের যিকির খুব বেশি করিয়া কর।"- (সূরা আহযাব, আয়াতঃ ৪১)

অর্থাৎ, রাত্রে, দিনে, মাঠে, ময়দানে, কাজে, কামে, নদী, বন্দরে, ঘরে, সফরে, অভাবে, সচ্ছলে, সুস্থ, অসুস্থ, আস্তে, জোরে সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করো।

হাদীসে এরশাদ হয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন," কিয়ামতের দিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে যে, বুদ্ধিমান লোকেরা কোথায়? মানুষ জিজ্ঞাসা করিবে বুদ্ধিমান লোক কাহারা? উত্তরে বলা হইবে, যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া এবং শয়ন অবস্থায়ও অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকির করিত। আর আসমান জমিনের সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে চিন্তা ফিকির করত।আর বলিত, আয় আল্লাহ আপনি এই সব কিছুকে অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই।"-(দূররে মনসূর)

হযরত আব্দুল্লাহ জুল- বেজাদাইন (রাজি:) ইসলাম গ্রহণের পর হুযুর পাক (সা:) এর দরবারে পড়ে থাকতেন এবং অত্যধিক পরিমানে ও উচ্চস্বরে কোরআন তেলাওয়াতের ও যিকির করতেন। এটা দেখে হযরত ওমর (রা:) বলিলেন, এইভাবে উচ্চস্বরে যিকির করে ; লোকটা কি রিয়াকার?
তখন হুযুর পাক (সা:) বললেন-" না, সে কোমলপ্রাণ লোকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত "

বিখ্যাত বুজুর্গ হযরত ফোযায়েল ইবনে আয়াজ (রহ:) বলেন- কোন আমল এইজন্য না করা যে, মানুষ দেখিবে- ইহায় রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানোর অন্তর্ভুক্ত। আর লোক দেখে ফেলবে বলে আমল ছেড়ে দিবে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, যতবেশি যিকির করা সম্ভব হয় উহাতে কোন রকম ত্রুটি করা চায় না।লোকদের পাগল অথবা রিয়াকার বলার কারনে জিকির ছাড়িয়া দেওয়ার মধ্যে নিজেরেই ক্ষতি। সুফিয়ায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, ইহাও শয়তানের একটি ধোকা যে, শয়তান প্রথম প্রথম জিকির হইতে মানুষকে এই বাহানায় ফিরাইয়া রাখে যে, লোকে দেখিয়া ফেলিবে অথবা কেউ দেখিয়া ফেলিলে কি বলিবে, ইত্যাদি।কিন্তু আপনি দেখবেন ফরজ নামাজ, যাকাত, হজ্জ, দান সদকা, ইসলামী আন্দোলন ইত্যাদি কেউ না কেউ তো দেখে, এজন্য কি কেউ আমল ছেড়ে দেয়? অবশ্যই না বরং এখলাসের সাথে আমল করার কথা বলা হয়েছে। তাই জিকিরের বিষয়ে নিশ্চয়ই এটা শয়তানের বড় ধোকা। তারপর জিকির হইতে ফিরাইয়া রাখার ব্যাপারে শয়তানের জন্য ইহা একটি স্থায়ী মাধ্যম ও বাহানা মিলিয়া যায়।কারণ জিকিরকারীর অন্তরে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না। এজন্যই ইহা জরুরী যে, দেখানোর নিয়তে কোন আমল

করিবে না, কিন্তু যদি কেউ দেখিয়া ফেলে দেখুক, উহার কোন পরোয়াও করিবে না, আর এই কারণে আমল ছাড়িয়া দেওয়াও উচিত নয়।

উপসংহারঃ

শরীয়াতের হুকুম আহকাম অনেক। শরীয়াতের প্রত্যেক হুকুমের উপর আমল করা তো জরুরী। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণতা হাসিল করা এবং সবগুলির মধ্যে সর্বদা মগ্ন থাকা কঠিন। কারণ, নামাজ পড়লেও কিছু সময় নির্দিষ্ট করা, চাইলেও কেউ সারাদিন নামাজে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, আবার কোরআন তেলাওয়াত করতে চাইলেও কেউ সারাদিন কোরআন তেলাওয়াত করতে পারে না হাফেজ ছাড়া, তারপরও সারাদিন করাটা কষ্টসাধ্য। যাকাত কেউ সারাদিন ধরে দেয় না। হজ্জও কেউ সারা বছর ধরে করে না। আবার দান সদকা কেউ সারা বছর ধরে দেয় না।আবার জিহাদও সারা বছর ধরে হয় না, যার কারণে এই বৃহৎ সময় আমরা আমলশুন্য অবস্থায় থাকলে শয়তান আমাদেরকে পদস্খলিত করবেই তার উপর আমাদের ধ্বংসের বিভিন্ন পথও বের করবেই । কাজেই এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে মজবুতভাবে আকড়াইয়া ধরা উচিৎ যাহা উঠা,বসা, চলা, ফেরা সর্বাবস্থায় আমল করা যায়।

জিব্বাহ কে জিকিরের দ্বারা তরতাজা রাখার অর্থ অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম বেশি বেশি জিকির করা লিখিয়াছেন। প্রচলিত ভাষার মধ্যেও এই ধরনের ব্যবহার পাওয়া যায় যেমন কেউ কাহারো বেশি প্রশংসা করিলে বলা হয়, অমুকের প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ, কিন্তু অধমের খেয়ালে ইহার আরেকটি ব্যাখ্যা হইতে পারে, উহা এই যে, যাহার প্রতি ইশক ও মহাব্বত হয় তাহার নাম লইলে মুখে একপ্রকার মজা অনুভব হয়। যে ব্যক্তি মহাব্বত জগতের কিছুটাও সংস্পর্শ পাইয়াছে সে ইহা বুঝিতে পারে। এই হিসাবে অর্থ হইল আল্লাহর নাম এমন ভাবে স্বাদ করিয়া লও যেন মজা আসিয়া পড়ে। আমি অনেক বুযুর্গের কথা শুনিয়াছি, আওয়াজ করিয়া জিকির করিতে করিতে তাহাদের জিব্বা এমন ভাবে ভিজিয়া যাইত যে, পাশে বসা লোকও তাহা অনুভব করিতে পারিত। মুখে পানিতে এরূপ ভরিয়া যাইত যা সকলেই বুঝিতে পারিত, কিন্তু এই অবস্থা তখনই হইতে পারে যখন অন্তরে মহব্বতের স্বাদ থাকে এবং জবান বেশি বেশি জিকির অভ্যস্ত হইয়া যায়।

এক হাদীসে আসিয়াছে, আল্লাহর সহিত মহব্বতের আলামত হইল, তাহার জিকিরকে মহব্বত করা আর আল্লাহর সহিত বিদ্বেশের আলামত হইল তাহার জিকিরের সহিত বিদ্বেশ রাখা। আর মুনাফেকরাই জিকিরকারীর প্রতি বিদ্বেশ রাখে।যেখানে বলা হয়েছে স্বয়ং শয়তানও জিকিরকারীকে ভয় পায়। কারণ, কল্বে যখন মহান আল্লাহর জিকির চলে শয়তান ঐ অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। সহিহ বুখারীতে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন -" মানবদেহে একটি মাংসখন্ড আছে সেটা যদি পবিত্র হয়, গোটা দেহই পবিত্র হয় আর সেটা যদি অপবিত্র হয়, গোটা দেহই অপবিত্র হয়ে যায়, আর জেনে রেখো তা হলো মানুষের অন্তর বা ক্বলব।"

আর অধিক পরিমানে জিকিরে লিপ্ত থাকা ব্যক্তির অন্তর থেকে দুনিয়ার মোহাব্বত দূর হয়ে যায়, মহান আল্লাহর প্রতি মোহাব্বত এমনভাবে এসে যায় যে, দুনিয়ার কুকর্ম (হিংসা, অহংকার, রাগ, গোনাহযুক্ত কাজ) তার অন্তর থেকে দুর হয়ে যায়, ক্বলব পবিত্র হয়।

বান্দা যে পরিমাণ আল্লাহ তায়ালার দিকে মনোযোগী হয়, আল্লাহ তাআলার দয়া ও মেহেরবানী বান্দার প্রতি উহা হইতে আরোও অনেক বেশি হয়। নিকটবর্তী হওয়া ও দৌড়াইয়া আসার অর্থ ইহায় যে, খুব দ্রুতবেগে আল্লাহর রহমতের বান্দার দিকে অগ্রসর হওয়া। অতএব, আল্লাহর রহমতকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করা বান্দার এখতিয়ারভুক্ত ব্যাপার।কাজেই যে,যে পরিমাণ রহমত পায়তে চায়, সে যেন ঐ পরিমাণ আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়।

হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যাহাদের জিব্বা আল্লাহর জিকির দ্বারা তরতাজা থাকে তাহারা হাসিতে হাসিতে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।